নাট্য কবিতায় রবীন্দ্রনাথ

নাট্য কবিতায় রবীন্দ্রনাথ

হরনাথ পাল

ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ :
মহালয়া, ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
বঙ্কিম বিহারী রায়
অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭/এ, বলাই সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

মূল্য : দুই টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা মাত্র

সূচীপত্র

পূর্ব্বভাষ

সমুদ্র শুধু বিস্ময় ও সম্ভ্রমবোধেরই উদ্রেক করে না, দর্শকের মনে ভয়ও জাগায় প্রচুর। রবীন্দ্র সাহিত্য-বারিধি সম্পর্কেও এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য। একের ভিতর বহুর মিলন সাধনায় ধন্য সে সাহিত্য। একটা গোটা যুগের সমস্ত সাহিত্য-ভাবনাই যেন রবীন্দ্রনাথরূপী কবিপুরুষের একক সাহিত্য-সাধনার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। বিচিত্র সৃষ্টিতে সার্থক এমন প্রতিভা বিশ্ব-সাহিত্যেও খুব সুলভ নহে। ভয়সঙ্কুচিত শ্রদ্ধানতচিত্তে সেই বিরাট সৃষ্টিকার্য্যের সামান্য একটি অংশের পরিচয় গ্রহণই বর্ত্তমান প্রয়াসের লক্ষ্য।

নাট্যকবিতা রবীন্দ্র-সাহিত্য-বারিধির সামান্য একটি তরঙ্গ মাত্র। কিন্তু সামান্য হইলেও ইহা উপেক্ষণীয় নহে; বরং রবি-প্রতিভার মূল প্রবৃত্তির সহিত ইহা নাটক হইতেও নিবিড়তর অন্তরঙ্গসূত্রে গ্রথিত। নাট্যকবিতা কবি-শিল্পী রবীন্দ্রনাথের উন্নত মহিমাজ্ঞাপক সৃষ্টি।

বিভিন্ন লেখকের রচিত রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধীয় আলোচনা গ্রন্থগুলিতে নাট্যকবিতার আলোচনাও স্থান পাইয়াছে, কিন্তু সে আলোচনা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। ইহার নিজস্ব স্বতন্ত্র মূল্য নিরূপণের চেষ্টা সেখানে অনুপস্থিত। উপন্যাসের সহিত ছোটগল্পের যে পার্থক্য নাটকের সহিত নাট্যকবিতার পার্থক্য উহার চেয়ে বেশী বৈ কম নহে। উপন্যাস হইতে ভিন্ন করিয়া ছোটগল্পের এবং গীতিকবিতা হইতে ভিন্ন করিয়া গানের স্বতন্ত্র আলোচনার যদি অবকাশ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে শুধু রবীন্দ্রনাথের নাট্য-কবিতাগুলিকে লইয়াই একখানি স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনার প্রয়োজনও অস্বীকার করা যায় না। সেই প্রয়োজনের কথা মনে রাখিয়াই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি রচনা করিতে উৎসাহ বোধ করিয়াছি।

এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভার স্বরূপ নির্ণয়ের কোন চেষ্টা করা হয় নাই; কবির একান্ত আত্মগত গীতিকাব্যিক অনুভূতির সহিত নাটকীয় আবেগ মিলিত হইয়া বাংলা সাহিত্যে নাট্যকবিতা নামক যে অভিনব এক সাহিত্য-রূপের সৃষ্টি করিয়াছে উহারই পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা করা গিয়াছে মাত্র। সেই

চেষ্টায় যদিও কোন কোন ব্যাপারে আমার মনের সংশয়-জিজ্ঞাসাকে বিনা দ্বিধায় পাঠকের কাছে উপস্থিত করিয়াছি তথাপি মুক্তকণ্ঠেই ইহা স্বীকার করিতেছি যে, নাট্যকবিতায় রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধি তাঁহার কবিতা, গান ও ছোটগল্পের পরেই। বাংলা সাহিত্যে নাট্যকবিতার ধারা প্রবর্ত্তনে রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রথম পথিকৃতের গৌরবভাগীই নহেন, সার্থক সৃষ্টির গৌরবও তাঁহারই প্রাপ্য।

সমগ্র বক্তব্যকে আমি পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম পরিচ্ছেদে রহিয়াছে বিষয় নির্দ্দেশ, বিশিষ্ট ভাবচিন্তাকে আশ্রয় দান করিয়া কিভাবে এক নূতন সাহিত্য-ভঙ্গী রূপসন্ধানী কবিদৃষ্টির সামনে দেখা দিল সেই বিবরণ দেওয়া হইয়াছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে যথাক্রমে স্থান পাইয়াছে নাট্যকবিতাগুলির কাহিনী-কথা, সাহিত্যিক উৎকর্ষ বিচার এবং কবিস্বভাবের সহিত ঐ রীতির নিবিড় যোগবন্ধনের কথা।

এই গ্রন্থ রচনার সুরু হইতে প্রকাশকাল পর্য্যন্ত অশেষ সাহায্য পাইয়াছি শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজপ্রতিম শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য এম. এ., পি. আর. এসের কাছে। এই সুযোগে তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ক্যালকাটা বুক হাউসের স্বত্বাধিকারী শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়ালের চেষ্টার ফলেই বইটি শীঘ্র প্রকাশিত হইতে পারিল, সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

ঝাড়গ্রাম রাজকলেজ,
ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর।

হরনাথ পাল

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রটিতে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনই সোনার ফসল ফলাইয়াছেন। তবু 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'কল্পনা'র যুগকে রবীন্দ্রসাহিত্যের সমৃদ্ধতম যুগ বলা যায়। শুধু কাব্যের ক্ষেত্রেই নয়, কাব্যানুভূতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত অপর দুইটি বিভাগেও—ছোটগল্প ও নাট্যকবিতা—এই সময়েই কবি-প্রতিভার সার্থকতম বিকাশ ঘটে। 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' ও 'প্রভাত-সঙ্গীতে'র কবি এইক্ষণে আপন প্রতিভার স্বধর্ম্মের পরিচয় পাইয়া যেমন বিচিত্র ভাবে ও সজ্জায় কাব্য-রূপের উত্তরোত্তর শ্রী সম্পাদন ও উৎকর্ষ বিধান করিতে থাকেন তেমনি নানা ঘটনাচক্রে এইকালে দুঃখ-দৈন্য-জরাপীড়িত মানব-সংসারের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইবার ফলে তিনি একদিকে 'স্বর্গ হইতে বিশ্বাসের ছবি' আনয়ন করিয়া উহার দীনতা ও হতাশ্বাসের বেদনা ঘুচাইবার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেন এবং অন্যদিকে সমাজ-সংসারের ভিতর ও বাহিরের অসামঞ্জস্যের চিত্র অঙ্কিত করিবার প্রবল প্রেরণা লাভ করেন। এই জীবন-পরিচয়ের পরিণাম সূত্রেই কবির নিভৃত নিকুঞ্জের একক ভাব-সাধনায় বিঘ্ন দেখা দিল, কাব্যের অনাবিল ভাবসৌন্দর্য্যের মধ্যে জীবনের সূক্ষ্ম সুর জাগিল। ঐ জীবনমুখিতার পথ ধরিয়াই কাব্যের সঙ্গে আসিয়া জুটিল ছোটগল্প ও নাট্যকবিতা। এইকালে কবির জীবনানুধ্যান গোধূলি লগ্নের বিশ্ব-প্রকৃতির মত রহস্যময় এক মাধুরী মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়াও বস্তুনির্ভরতা লাভ করিয়াছিল। অপূর্ব্ব শোভা-সৌন্দর্য্যময়, প্রচুর সঙ্গীত-ধ্বনিপূর্ণ গীতিকবিতার ফলনে, ছোটগল্পের স্বল্পবর্ণিত কাহিনী, ঘটনা ও বিচিত্র চরিত্রের রহস্যঘন অনুপম মোহাবেশ সৃষ্টিতে এবং নাট্যকবিতার অন্তর্দ্বন্দ্বময় আত্মিক উৎকণ্ঠার পরিণাম চিত্রের সূক্ষ্মতম মাধুর্য্য বিকাশে কবির সেই ঐকান্তিক জীবনানুভূতি সর্ব্বোত্তম প্রকাশের পথটিই পাইয়াছিল। তথাপি এই তিনটি ধারার গুরুত্ব সমান নহে। নিঃসন্দেহে নাট্যকবিতা সেই বিচিত্র সৃষ্টি-কর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অংশ। বর্ত্তমান গ্রন্থে আমরা সেই ক্ষুদ্রতম বিভাগটি সম্পর্কেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

উপরে যে যুগটির উল্লেখ করা গেল উহার বেশ কিছু কাল পূর্ব্ব হইতেই রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যিক প্রেরণার মধ্যে নাটকীয় অনুভূতির নীরব এবং গোপন পদসঞ্চার লক্ষ্য করা যাইতেছিল। এ সম্পর্কে তাঁহার একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র[১] সূচনায় কবি লিখিয়াছেন,—

> একটা সময় এসেছিল, যখন আমার গীতিকাব্যিক মনোবৃত্তির ফাঁকের মধ্যে মধ্যে নাট্যের উঁকিঝুঁকি চলছিল। তখন সংসারের দেউড়ী পার হয়ে ভিতর মহলে পা দিয়েছি; মানুষে মানুষে সম্বন্ধের জালবুনোনিটাই তখন বিশেষ ক'রে ঔৎসুক্যের বিষয় হয়েছিল।[২]

রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রথম পর্ব্বে এই নাট্যচেতনার মেয়াদ ১৮৮১ সাল হইতে ১৮৯৬ সাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখা যায়। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় ইহার সুরু, 'মালিনী'তে ইহার সমাপ্তি।

নাট্যকবিতাগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্রকাশিত নাট্য-লক্ষণযুক্ত অন্যান্য সৃষ্টিরও কতকটা পরিচয় লওয়া দরকার। ইহাদের মধ্যে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' (১৮৮১), 'কাল-মৃগয়া' (১৮৮২) এবং 'মায়ার খেলা' (১৮৮৮) গীতিনাট্যের অভিধা লাভ করিয়াছে। 'মায়ার খেলা'র প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন হইতে এখানে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সেখানে বলিয়াছেন,—

> ইহার আখ্যানভাগ কোন সমাজ বিশেষে বদ্ধ নহে। সঙ্গীতের কল্পরাজ্যে সমাজ-নিয়মের প্রাচীর তুলিবার আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। কেবল বিনীতভাবে ভরসা করি, এই গ্রন্থে সাধারণ মানব-প্রকৃতি বিরুদ্ধ কিছু নাই।[৩]

'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'কাল-মৃগয়া'র উদ্দেশ্য সম্পর্কেও এই মন্তব্যটুকু প্রায় সমভাবেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ তিনটিরই আবেদন মুখ্যত সঙ্গীতের কল্পরাজ্যের। একটি নাটকীয় কাঠামোতে কবিচিত্তে সঞ্জাত কোন একটি বিশিষ্ট ভাবচিন্তাকে

১। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র প্রকাশ ১৮৮১ সালে, মানসীর প্রকাশ কাল ১৮৯০ সাল

২। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড

৩। ঐ, ঐ

মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় 'ভগ্ন হৃদয়' (১৮৮১), 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪), 'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯), 'বিসর্জ্জন' (১৮৯০), 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯১) ও 'মালিনী'তে (১৮৯৬)। নাটকীয় ধর্ম্মের গুরুত্ব বিচারে ইহারা নিঃসন্দেহে গীতিনাট্যের এক ধাপ উপরের বস্তু। এখানে প্রায়শ কাব্য গানের স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ভাববস্তুও কতক পরিমাণে জীবন-সমস্যার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তবু ইহারাও সকলে এক শ্রেণীর নহে। 'ভগ্ন হৃদয়', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' এবং 'মালিনী'তে নাট্য-লক্ষণ অপেক্ষা কাব্য-লক্ষণই অধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; কিন্তু কাব্যোচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি থাকা সত্ত্বেও 'বিসর্জ্জন' এবং 'রাজা ও রাণী'তে বাহিরের কাঠামোটি ছাড়াও চরিত্র চিত্রণ এবং ঘটনা সন্নিবেশের মধ্যে কিছুটা নাট্যধর্ম্ম দেখা দিয়াছে। কাব্যের মধ্যেই কতক পরিমাণে নাট্য-লক্ষণ প্রকাশ পাওযায় অর্থাৎ নাট্যধর্ম্মের দ্বারা কাব্য বিশেষিত হওয়ায় প্রথম তিনটিকে নাট্যকাব্য আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ঐ স্থানে ঐ নাটকীয় রূপ ও ভঙ্গীটি মন্ময় কবি-কল্পনার নিয়ন্ত্রণাধীন অতিশয় আত্মগত ভাবরাজি প্রকাশেরই একরূপ সহায়ক হইয়াছে। পরবর্ত্তী দুইটিকে একটি ভিন্ন নামে চিহ্নিত করাই সমীচীন হইবে। কেননা, কাব্য ও নাট্যের সীমার মধ্যে অবিরাম লুকাচুরি খেলা চলিবার পরও এই দুইটি সৃষ্টির মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত নাট্যাবেগই প্রবলভাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে। আগের সূত্র ধরিয়াই ইহাদের বলা যাইতে পারে কাব্যনাট্য। ইহাদের অভিমুখিতা স্পষ্টতই নাটকের দিকে; কাব্য সেই স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন গতিকে কিছুটা বিশিষ্ট ও প্রভাবিত করিয়াছে মাত্র। অবশ্য ইহাদের মধ্যেও যে লিরিকের বড় বেশী বাড়াবাড়ি ঘটিয়াছিল কবি সে-বিষয়েও সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন।[১] 'শেষের কবিতা' যেমন উপন্যাসের আধারে অনুপম কাব্য-সৃষ্টি 'চিত্রাঙ্গদা'ও তেমনি নাটকের আধারে বিচিত্র সৌন্দর্য্য-শোভাময় অপরূপ এক কাব্য-বিগ্রহ। পূর্ব্ববর্ত্তী কালের রচনা হইলেও 'চিত্রা' ও 'কল্পনা'র সহিতই যেন ইহার অধিক সগোত্রতা। এই কালে রচিত 'গোড়ায় গলদ', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্রভৃতি প্রহসন-গুলির কথা অপ্রয়োজন বোধে আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করিলাম না।

দীর্ঘকাল কবি-মানসে কাব্য ও নাট্য-রূপের মধ্যে এই ধরণের সংঘাত চলিবার পর রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ নিশ্চিত হইতে পারিয়াছিলেন যে নাটক নয়,

১। দ্রষ্টব্য, 'বিসর্জ্জন' এবং 'তপতী'র ভূমিকা

কাব্যই তাঁহার ভাব প্রকাশের প্রকৃত মাধ্যম। কাজে কাজেই তিনি নাটক রচনার চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কাব্য রচনায় অধিকতর মনোযোগী হইলেন। অন্তত তের চৌদ্দ বৎসর তাঁহাকে আর নাটক রচনা করিতে দেখা যায় না। এমন কি, ইহারও পরবর্ত্তী কালে নাটক অভিধেয় তাঁহার যে সকল মৌলিক সৃষ্টি উহাদেরও অধিকাংশই প্রতীক ও রূপকধর্ম্মী নাটক আখ্যা লইয়া এমন দুই স্বতন্ত্র গোত্রের অধীন হইয়াছে যাহার সহিত পূর্ব্বের ধারার সম্পর্ক অতিশয় ক্ষীণ বা অনুপস্থিত। এই দুই প্রধান রূপের বাহিরে কবির পরবর্ত্তী জীবনে অন্য যে সকল নাট্য-সৃষ্টি দেখা যায় তাহাদের মধ্যে কয়েকটি কোন গল্প বা উপন্যাসের নাট্য-রূপ, কয়েকটি বা আগেকার নাটকগুলিরই সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত রূপ-কর্ম্ম। মাঝখানকার নাটক রচনার এই বিরতির যুগে রবীন্দ্রনাথ এক ভিন্নতর রূপ-সৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রথমাবধি অনুভূত তাঁহার নাটকীয় আবেগটিকে পাত্রান্তরিত করিয়া লইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইহারই ফলে বাংলা সাহিত্যে নাট্য-কবিতা নামক এক অভিনব সাহিত্য-রূপের সৃষ্টি। 'সংবাদ' শব্দের অর্থ 'অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশসূচক কথোপকথন'[১] ধরিলে এই নব সৃষ্টিকে 'সংবাদ-কবিতা' অভিধাও দেওয়া যাইতে পারে। অন্তত একটি নাট্যকবিতার ঐরূপ নামকরণ তো কবি স্বয়ংই করিয়াছেন।[২]

নাটক হইতে নাট্যকবিতার পথে যাত্রার ইঙ্গিত এই সময়ের অনেকগুলি কবিতার মধ্যেই পাওয়া যায়। 'সোনার তরী', 'পুরস্কার', 'দুই বিঘা জমি,' 'ব্রাহ্মণ', 'পুরাতন ভৃত্য'[৩] 'আবেদন', 'জীবন-দেবতা, 'পরিশোধ' 'পূজারিণী', 'সামান্য ক্ষতি', 'মানী,' 'শেষ ভিক্ষা', 'পতিতা', 'ভাষা ও ছন্দ' প্রভৃতির মধ্যে একমাত্র 'আবেদন' কবিতাটি ছাড়া অন্য কোনটিতেই নাটকের কোন বাহ্য লক্ষণ উপস্থিত নাই। 'আবেদন'ও কথোপকথনের ভঙ্গীতে রচিত মাত্র, তদতিরিক্ত কোন নাট্য-লক্ষণ ইহাতেও সাধারণের চোখে পড়িবার নহে। তবু আমরা বলিব যে, উল্লিখিত প্রতিটি কবিতাই

১। দ্রষ্টব্য, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাংলা অভিধান'

২। দ্রষ্টব্য, 'কর্ণ-কুন্তীসংবাদ'। পঞ্চভূতে 'কাব্যের তাৎপর্য্য' প্রবন্ধে ''বিদায়-অভিশাপ'কেও বলা হইয়াছে 'কচ-দেবযানী সংবাদ'।

৩। 'ব্রাহ্মণ', 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুই বিঘা জমি'—কথা ও কাহিনীতে সংকলিত হইয়াছিল। রচনাবলিতে সেগুলি কথা ও কাহিনীতেই মুদ্রিত হইবে, চিত্রা হইতে সেগুলি বর্জিত হইল।—গ্রন্থপরিচয়, র. র. ৪র্থ খণ্ড

Dramatic Lyric-এর লক্ষণাক্রান্ত; এমন কি, অস্পষ্ট হইলেও, কোন কোনটির মধ্যে Dramatic Monologue-এরও কিছুটা আভাস রহিয়াছে। কোথাও বা নাটকের সংলাপ কবিতার ভাবের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে মিশিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা নাটকীয়তা কবিতার স্বচ্ছন্দ ভাবস্রোতে উত্তাল আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা ছাড়া, 'মানসী'র 'নারীর উক্তি', 'পুরুষের উক্তি', 'ব্যক্ত প্রেম', 'গুপ্ত প্রেম' শীর্ষক যুগ্ম কবিতাগুলির নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক প্রমথ নাথ বিশী এই কবিতা কয়টিকে পাত্র-পাত্রীর দ্বারা কথিত 'নাটকীয় উক্তি' শ্রেণীর কবিতা বলিয়া স্পষ্টতই উল্লেখ করিয়াছেন।[১]

১। দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ, ১ম খণ্ড, ৫৮ পৃঃ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একটি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সব কয়টি নাট্যকবিতাই 'কাহিনী' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। 'কাহিনী'র প্রথম প্রকাশ ২৪শে ফাল্গুন, ১৩০৬ সাল (ইং ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ)। ইহা 'পতিতা' এবং 'ভাষা ও ছন্দ' নামক দুইটি কবিতা এবং 'গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'নরক বাস', 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা', ও 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' নামক পাঁচটি নাট্যকবিতার সংকলন। 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' 'কাহিনী' প্রকাশের মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে রচিত, অন্যগুলি ন্যূনাধিক ইহার বৎসর দুই পূর্ব্বের রচনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাট্যকবিতা 'বিদায় অভিশাপ' রচিত হয় ১৩০০ সালের ২৬শে শ্রাবণ। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ছয়টি নাট্যকবিতার রচনা কাল ছয় বৎসরেরও অধিক সময় পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

সংলাপাত্মক অথবা নাটকীয় সম্ভাবনাযুক্ত কাব্য-কবিতার অসদ্ভাব বাংলা সাহিত্যে কখনই ছিল না। বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, বৈষ্ণবপদাবলী, আগমনী এবং বিজয়া সঙ্গীতের কথা। ইহাদের তো নাটগীতিই বলা হইত। তাহা ছাড়া, প্রাচীন কাল হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রচিত অনেক কাহিনী-কাব্যের মধ্যেই 'নাটকীয় উক্তি' শ্রেণীর কাব্যাংশ চোখে পড়ে। নব্য-মহাকাব্যগুলির মধ্যেও এই লক্ষণ প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে কয়টি সৃষ্টিকে উপরে নাট্যকবিতা নামে চিহ্নিত করা গেল উহারা সেই জাতগোত্র হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের বস্তু,—নিত্য নব রসরূপের আবিষ্কারধর্ম্মী কবিপ্রতিভার অভিনব এক রূপ-কর্ম্ম। গীতিকবিতার লিরিক সুর মূর্চ্ছনাকে আশ্রয় করিয়া উহারই মধ্যে জীবনের নাট্যসুলভ কোন গূঢ় গভীর উৎকণ্ঠা বা জটিল সমস্যা নিবৃত্তির উপায় স্বরূপ এই বিশিষ্ট সাহিত্য প্রকরণটি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবিদের অনেকেরই অত্যন্ত প্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহাদের অনুসরণেই বাংলা সাহিত্যে এই ভঙ্গীটি প্রবর্ত্তন করিতে উৎসাহ বোধ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহের অবকাশ খুবই কম।[১] ব্রাউনিং-এর Dramatic Lyric বা Dramatic Romance-এর চরিত্র পরিকল্পনার সূক্ষ্ম সূত্রটি যথাযথভাবে আয়ত্ত করিতে না পারিলেও শেলীর

১ দ্রষ্টব্য, প্রভাত মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড, ৩৪১ পৃষ্ঠা

'The Cenci', 'Prometheus Unbound', 'Oedipus Tyrannus', এবং 'Hellas' প্রভৃতির উত্তুঙ্গ ভাব-বিহার ও সংহত গঠনরীতি এবং টেনিসনের 'Morte D' Arthur', 'Ulysses' ও 'Love and Duty' প্রভৃতি কবিতার সঙ্গীতাত্মক প্রকাশসৌকর্য্য এবং চরিত্রের জটিল, গভীর, সূক্ষ্ম অনুভূতি চিত্রণের নিপুণতা ও ভাবচিন্তার ঐশ্বর্য্য রবীন্দ্রনাথকে নিঃসন্দেহে এই রূপকল্পটির প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। কিন্তু, ইংরেজ কবিদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া ঐ ফরমটির সাহিত্যিক মূল্য এবং আপন সৃষ্টিকর্ম্মে উহার অন্তর্ভুক্তির উপযোগিতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইলেও স্বতন্ত্র ধর্ম্মবিশিষ্ট কবিতা ও নাটকের মধ্যে অদ্বয় যোগ-সাধনক্ষম যে যাদুশক্তির উপর এই জাতীয় সৃষ্টির অনন্য সার্থকতা নির্ভর করে রবীন্দ্রনাথের নিজের প্রতিভায় সেই শক্তি প্রচুর পরিমাণেই বর্ত্তমান ছিল। প্রায়শ গীতিকবিতার উপজীব্য বিষয় লইয়া নাট্যরস সৃষ্টির আগ্রহ এবং তন্ময় ও মন্ময় ভাবকল্পনার মধ্যে রাখি-বন্ধনের যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা এইকালে কবিকে নূতন বাণীমূর্ত্তি নির্ম্মাণের জন্য অধীর করিয়া তুলিয়াছিল এই নাট্যকবিতাগুলি মূলত সেই প্রেরণা হইতেই জাত। কবির গভীর আন্তরিক অনুভূতি ঐ কাঠামোটির আশ্রয় লইয়া এক অনুপম শিল্পমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যত নাট্য জাতীয় সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে তাহাদের সহিত তুলনায় সাহিত্য-কর্ম্ম হিসাবে ইহারা অধিকতর সার্থক। ইহার কারণ পরে যথাস্থানে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এখানে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কবির অত্যন্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি ও ভাব-চিন্তা সমাজ-চেতনার সহিত মিলিত হইবার আগ্রহে ঐ নূতন রূপটি নির্ম্মাণ করিয়া উহার ভিতর দিয়া অতিশয় স্বচ্ছন্দভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহাদের বহিরঙ্গে যেমন দেখা দিয়াছে নাটকের সংযম, দৃঢ়তা, বলিষ্ঠতা, তেমনি অন্তর জুড়িয়া প্রকাশ পাইয়াছে বিচিত্র গীতি-মাধুর্য্য ও অসংখ্য ভাবের অতি সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য। চিত্ররস, কাহিনীর নাটকীয়তা এবং কাব্যসৌন্দর্য্য একাধারে মিলিত হইয়াই এই রূপটির অপূর্ব্বতা সাধন করিয়াছে। যে মানসিক অবস্থায় নাট্যকবিতার ফসল ফলিয়াছিল উহার পরিচয় প্রদান করিতে গিয়া কবি জানাইয়াছেন,—

একদিন এলো যখন আর একটা ধারা বন্যার মতো মনের মধ্যে নামলো। কিছুদিন ধরে দিল তাকে প্লাবিত করে। ইংরেজী

অলঙ্কার শাস্ত্রে এই শ্রেণীর ধারাকে বলে ন্যারেটিভ অর্থাৎ কাহিনী। এর আনন্দবেগ যেন থামতে চাইলো না। * * * * মনের এই অবস্থায় কখনো কখনো কাহিনী বড়ো ধারায় উৎসারিত হয়ে নাট্যরূপ নিল। * * * এমনি করে এই সময়ে আমার কাব্যে একটা মহল তৈরী হয়ে উঠেছে যার দৃশ্য জেগেছে ছবিতে, যার রস জেগেছে কাহিনীতে, যাতে রূপের আভাস দিয়েছে নাটকীয়তায়। [১]

আর একটি প্রসঙ্গও এখানে উত্থাপিত করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস এই সময়েই প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য্যলোক, ভাবলোক ও ধ্যানলোকে প্রবেশ করিয়া একদিকে যেমন মোহাবিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি প্রাচীন আদর্শ হইতে বর্ত্তমানের বিচ্যুতিতে তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহতও হইয়াছিলেন। 'কথা', 'কল্পনা' এবং 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে সে-প্রমাণ সুস্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য্যলোকবিহারী মুগ্ধ কবি একদিকে যেমন বলিয়াছেন,—

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে
মোর পূর্বজনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনু দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা-আধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহু দূরে পথ চিনে চিনে ॥[২]

অপর দিকে তেমনই তাঁহার মুখে শুনি,—

আরবার এ ভারতে কে দিবে গো আনি'
সে মহা-আনন্দমন্ত্র, সে উদাত্ত বাণী

১। কথা গ্রন্থের সূচনা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৭ম খণ্ড

২। স্বপ্ন : কল্পনা

সঞ্জীবনী, স্বর্গে মর্ত্যে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরম ঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃতবার্তা।
রে মৃত ভারত!
শুধু এক সেই আছে, নাহি অন্য পথ।[১]

অন্ধ-সংস্কারের অচলায়তন ভেদ করিয়া শাশ্বত সত্যের যে জ্যোতির্ময় রূপ উপনিষদের রসে পুষ্ট রবীন্দ্রনাথের মানস-নেত্রে ধরা পড়িয়াছিল প্রধানত তাহাই এই নাট্যকবিতাগুলির ভাব-মণ্ডলটি গঠন করিয়াছে। ঐ সত্যোপলব্ধির কথায় কবি বলিয়াছেন,—

আমার মনের মধ্যে ধর্মের প্রেরণা তখন গৌরীশঙ্করের উত্তুঙ্গ শিখরে শুভ্র নির্মল তুষারপুঞ্জের মতো নির্মল নির্বিকল্প হয়ে স্তব্ধ ছিল না, সে বিগলিত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলরূপে, মৈত্রীরূপে আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। নির্বিকার তত্ত্ব সে নয়, মূর্তিশালার মাটিতে, পাথরে নানা আকার নিয়ে মানুষকে সে হতবুদ্ধি করতে আসেনি। কোনো দৈববাণীকে সে আশ্রয় করেনি। সত্য যার স্বভাব, যে মানুষের অন্তরে অপরিমেয় করুণা তার অন্তঃকরণ থেকে সেই পরিপূর্ণ মানবদেবতার আবির্ভাব অন্য মানুষের চিত্তে প্রতিফলিত হতে থাকে। সকল আনুষ্ঠানিক, সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতা ভেদ করে তবেই এর যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ হতে পারে।[২]

কবিভাষিত এই নিত্য ধর্মের স্বরূপটি সুস্পষ্ট করিবার জন্য তাঁহার পরবর্তী জীবনের অসংখ্য মন্তব্য হইতেও নিম্নে একটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে।—

সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়। তাহা মনুষ্যত্বের

১। ৬০-সংখ্যক কবিতা : নৈবেদ্য

২। মালিনীর সূচনা ; রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড

> এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করে না—সমস্ত মনুষ্যত্ব তাহার অন্তর্ভূত—তাহাই যথার্থভাবে মনুষ্যত্বের ছোটোবড়ো, অন্তর-বাহির সর্বাংশে পূর্ণ সামঞ্জস্য। সেই সুবৃহৎ সামঞ্জস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যত্ব সত্য হইতে স্খলিত হয়, সৌন্দর্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। সেই অমোঘ ধর্মের আদর্শকে যদি গির্জার গণ্ডির মধ্যে নির্বাসিত করিয়া দিয়া অন্য যে কোনো উপস্থিত প্রয়োজনের আদর্শ দ্বারা সংসারের ব্যবহার চালাইতে যাই, তাহাতে সর্বনাশী অমঙ্গলের সৃষ্টি হইতে থাকে।[১]

এখানে বলা আবশ্যক যে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মতন্ত্রকে রবীন্দ্রনাথ কখনই অভিন্ন বলিয়া মনে করেন নাই। ধর্ম্মতন্ত্র ক্ষুদ্রতা ও দীনতার আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইতে থাকে; পক্ষান্তরে যে প্রয়াস, যে কর্ম্ম বিরাটের অভিমুখী, যাহার অন্তর সৌন্দর্য্যময় উদার সুরে পূর্ণ তাহাই ধর্ম্মের অন্তর্গত। উভয়ের পার্থক্য নির্দ্দেশকল্পে একদা তিনি লিখিয়াছিলেন,—

> ধর্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ সে যে ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যত বড় অভাজনই হোক, মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।[২]

এই অখণ্ড সত্যের আলোকে ভাস্বর, মঙ্গলময়, করুণারূপী, মৈত্রীসম্পন্ন মানবধর্ম্মকে দুঃখদৈন্যজরাপীড়িত মানব সংসারের ক্ষুদ্র স্বার্থদ্বন্দ্বের মধ্যে জাগ্রত করা রবীন্দ্রনাথ আপন কবি-ব্রত বলিয়া মনে করিতেন। নিত্য-ধর্ম্মের আশ্রয়প্রাপ্ত কবি-চিত্তের যে উল্লাস তাহাই এই নাট্যকবিতাগুলির ভাবৈশ্বর্য্যের নিয়ামক হইয়াছে, সেকথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নানা রূপে ও রেখায়, আভাসে ও ইঙ্গিতে এই সনাতন ন্যায়ধর্ম্মই ইহাদের মধ্যে বিচিত্রিত হইয়াছে। লৌকিক আচার অনুষ্ঠান, শাস্ত্রীয় সংস্কার ও তাহার নানা বিধিনিষেধ এবং জীবধর্ম্ম ও সমাজধর্ম্মাশ্রিত হিংসা, দ্বেষ, ক্ষয়ক্ষতির ক্ষুদ্র

১। ধর্মপ্রচার : ধর্ম

২। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম : কালান্তর, ৬১ পৃষ্ঠা

গণ্ডির বাহিরে অবস্থিত মঙ্গলময় মানবধর্ম্মের জন্য সাধক হৃদয়ের যে আকুতি বা সত্যৈষণা তাহাই নাট্যকবিতাগুলির মূল সুরটি নিরূপণ করিয়াছে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, অধিকাংশ নাট্যকবিতার নাটকীয় সংঘাতের একদিকে রহিয়াছে মহান মানবাত্মার সনাতন সত্যপ্রীতি অন্যদিকে দেখা দিয়াছে হীন স্বার্থজটিল, আত্মকেন্দ্রিক, সুখসম্ভোগমূলক লোকাচার ও দেশাচার। এই দুই বিপরীত শক্তি ও প্রবৃত্তির সংঘর্ষে প্রথমটিকে জয়ী করিয়া উহার অম্লান অবিনশ্বর মহিমাকে লোকচক্ষুর গোচর করানোই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়াছে। যে 'ধর্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজন সাধনের জন্য নহে, সমগ্র সংসারই ধর্মসাধনের জন্য, (যে) ধর্ম গৃহের মধ্যে গৃহধর্ম, রাজত্বের মধ্যে রাজধর্ম হইয়া ভারতবর্ষের সমগ্র সমাজকে একটি অখণ্ড তাৎপর্য দান করিয়াছিল' [১] সমাজ-সংসারের নানা সমস্যার সহিত উহার কঠোর সংঘর্ষের চিত্র এখানে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আদর্শ বা ভাবঘটিত এই যে দ্বন্দ্ব তাহা সর্ব্বক্ষেত্রে বাহিরের ঘটনারূপেই আত্মপ্রকাশ করে না। এই কারণেই এই নাট্যকবিতাগুলির অতীতের ঘটনা লইয়া রচিত হইতে কোন বাধা দেখা দেয় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, বাহিরের সংঘাত, গতি এবং ঘটনা-প্রবাহ অতিশয় স্তিমিত ও মন্থর। যাহা ঘটিবার ছিল তাহা ঘটিয়া গিয়াছে। ঘটনা ঘূর্ণীজালে আবর্ত্তিত জীবনের কোন চূড়ান্ত অবস্থায় এখন চলিয়াছে শুধু ঘটনা-শেষের পরিণাম বিচার। পাত্রপাত্রীরা অধিকাংশই নিজ নিজ শিক্ষা, দীক্ষা, বিবেক, রুচি ও অন্তঃপ্রেরণার ইঙ্গিত অনুযায়ী একটি সুস্থির আদর্শ বাছিয়া লইয়া উহাকেই জীবনের পথ চলার সম্বল করিয়াছে। কিন্তু একের ভাব, ভাবনা, আদর্শচিন্তার সঙ্গে অন্যের তো সর্ব্বদা পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটে না। তাই বিরোধ-সংঘাতের সৃষ্টি। কিন্তু ভাব ও আদর্শের বিরোধ বলিয়াই উহা বহুল পরিমাণে বাহিরের ঘটনাশ্রয়ী হইয়া উঠে নাই। কখনও কখনও একই চরিত্রে দুই বিপরীতমুখী ভাব বা ভাবনার আন্দোলন চলিয়াছে। সেরূপ ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব একান্তরূপেই অন্তর্মুখী হইয়াছে। আলোচ্য নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি মুহূর্ত্তের, বেশী হইলে কয়েক ঘণ্টার অনুতাপ-পরিতাপ, আবেদন-নিবেদন এবং আত্মসমীক্ষার ফলকে বিভিন্ন চরিত্রের মানস-স্পন্দনরেখাই মূলত অঙ্কিত হইয়াছে। Robert Browning সম্বন্ধে Sir Henry Jones এর মন্তব্যের সামান্য

১। ধর্মপ্রচার : ধর্ম.

পরিবর্ত্তন করিয়া রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতার পাত্রপাত্রীদের সম্পর্কেও অনেকটা নিশ্চয়তার সঙ্গেই যেন বলা যায়—

His men and women are embodiments of 'a priori' conceptions, meant to illustrate a doctrine or point a moral; and their intercourse with their fellows and interaction with the world have no genuinely fashioning potency·········Nothing quite new or quite unexpected ever happens to them··········He places us in the parliament of the mind. It is the powers of mind to which we listen in high debate.[১]

অর্থাৎ, তাঁহার পাত্রপাত্রীরা পূর্ব্বকল্পিত ধারণার প্রতি-রূপ; কোন তত্ত্বকে বিশদ করা বা নীতি প্রতিষ্ঠা করাই ইহাদের লক্ষ্য। সমশ্রেণীর ব্যক্তিদের সহিত তাহাদের দান প্রতিদান এবং জাগতিক ব্যাপারে তাহাদের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে চরিত্র বিকাশের সত্যকার কোন সংযোগসূত্র আবিষ্কার করা যায় না। ···· ···তাহাদের জীবনে সম্পূর্ণ অভিনব বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা কখনই ঘটে না।······তিনি যেন আমাদের মনের মহাসভায় দাঁড় করাইয়া দেন। আমরা মানসিক শক্তিগুলির অতি গুরুত্বপূর্ণ তর্কবিতর্ক শ্রবণ করিতে থাকি।

রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচক মহলানবীশের একটি মন্তব্যও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতার আলোচনায় তিনি বলিয়াছেন,—

They are studies of men and women placed in very difficult emotional situations. It is not drama, because there is very little movement. One might almost say that it is an instantaneous cross section of a powerful dramatic movement—something like a snapshot of a

১। The Cambridge History of English Literature, Vol XIII.

real drama. We get only a glimpse. We see the actors only in one particular situation. Nothing happens—we just see them.[১]

অর্থাৎ, ইহারা অতি সঙ্কটপূর্ণ ভাবাবেগের অধীন নরনারীদের চরিত্র-বিশ্লেষণ। ঘটনার গতিবেগ এত মন্থর যে ইহাদিগকে নাটক নামে অভিহিত করা যায় না। বরং বলা যায় যে, বাস্তব জীবন-নাট্যের এক নিমেষে-তোলা একটি আলোক-চিত্রের ন্যায় ইহা কোন একটি শক্তিশালী নাটকীয় গতিপ্রবাহের একটি নির্দ্দিষ্টকালীন জটিল রূপ। একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে উপস্থিত পাত্রপাত্রীদের আমরা এক ঝলক দেখি মাত্র। ঘটনা কিছুই ঘটিতে দেখি না, পাত্রপাত্রীদেরই কেবল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

১। Edward Thompson : Rabindranath Tagore (2nd ed.), page 160

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছয়টি নাট্যকবিতার মধ্যে একমাত্র 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ছাড়া অন্য কোনটির কাহিনীই মৌলিক নহে। 'সতী'র উৎস মারাঠা গাথা। বাকি কয়টি মহাভারতের আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। নাট্যকবিতায় মহাভারতের ঘটনা, চরিত্র ও কাহিনীর এতটা প্রাধান্য হয় ত একেবারেই আকস্মিক নহে। 'কাহিনী'র আত্মপ্রকাশের প্রায় মাস খানেক আগে 'কথা' নামক কবিতা সংকলনটি প্রকাশিত হয়। ইহার কবিতাগুলি ১৩০৬ সালের আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণের মধ্যে রচিত। ইহার অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে কৌতুকছলে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন,—

> কতকগুলি পৌরাণিক গল্প আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে—যেমন করিয়া হোক্ তাহাদের একটা গতি করিতে হইবে—তাহারা আমার কন্যাদায়ের মত—পাব্‌লিকের সহিত তাহাদের পরিণয় সাধন করিতে না পারিলে তাহারা অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিবে—কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধেও বাল্যবিবাহটা ভাল নয়—উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত ইহাদের কলরব ও উপদ্রব আমাকে সহ্য করিতেই হইবে।[১]

ইহা হইতে স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে যে, এই সময়ে পৌরাণিক কাহিনী, বৌদ্ধ গাথা এবং ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের বিষয় লইয়া কাব্য-কবিতা রচনা করিবার একটা প্রবল আগ্রহ তাঁহার মধ্যে দেখা দেয়। সেই আগ্রহই অবশেষে মহাভারতের বিচিত্র তত্ত্ব, ভাব, চিত্র, চরিত্র ও ঘটনার মহাপ্রদেশে প্রবেশ করিতে কবিকে উদ্বুদ্ধ করে। তাহা ছাড়া, মহাভারত হইতে বিষয় নির্ব্বাচন করিবার জন্য বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর নিকট হইতেও একটি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই সময় কবির কাছে আসে। 'কথা'-কাব্যের পৌরাণিক রস আস্বাদনে প্রীত হইয়া জগদীশচন্দ্র 'মহাভারত হইতে আরও অনেকগুলি' কবিতা লিখিতে বিশেষ করিয়া কর্ণ চরিত্রের উপর একটি কবিতা রচনা করিতে অনুরোধ করিয়া কবিকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

১। প্রথম পত্র (১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬), চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড

> একবার কর্ণ সম্বন্ধে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। ভীষ্মের দেবচরিত্রে আমরা অভিভূত হই, কিন্তু কর্ণের দোষগুণ মিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবনের সহিত আমাদের অনেকটা সহানুভূতি হয়। ঘটনাচক্রে যাহার জীবন পূর্ণ হইতে পারে নাই, যাহার জীবনে ক্ষুদ্রতা ও মহৎ ভাবের সংগ্রাম সর্বদা প্রজ্বলিত ছিল, যে এক এক সময়ে মানুষ হইয়াও দেবতা হইতে পারিত, এবং যাহার পরাজয় জয় অপেক্ষাও মহত্তর, তাহার দিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হয়।[১]

কবির মনের মধ্যে যে প্রস্তুতি চলিতেছিল তাহার সঙ্গে বাহিরের এই উপলক্ষ্যটি জড়িত হওয়ায় মহাভারতোক্ত আখ্যায়িকাশ্রয়ী 'কাহিনীর' নাট্য-কবিতা কয়টি একে একে সৃষ্ট হইল।

পূর্ব্ব-পরিচিত কথাবস্তু লইয়া অব্যাহত নাট্য-কৌতূহল জাগাইয়া রাখা অত্যন্ত শক্ত কাজ। সেই অসুবিধা দূর করিবার জন্য মূলের বিরোধিতা না করিয়াও পুরাতন কাহিনীকে নূতন তাৎপর্য্যে ভূষিত করিবার ও নূতনভাবে কাহিনী গ্রন্থনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ নিজের ভাবকল্পনা ও জীবনদর্শনের অনুগত করিয়া লইবার জন্য পুরাতন বিষয়বস্তুর কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন এবং এই উপায়েই পুরাতন কথাবস্তু, ঘটনা ও চরিত্র লইয়া রচিত নাট্যকবিতাগুলিতেও ক্রমবর্দ্ধমান কৌতূহল জাগাইয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। কোথায়ও কোথায়ও এমনও দেখা যায় যে, মহাভারত কবিকে সামান্য একটি সূত্র ধরাইয়া দিয়াছে মাত্র, তারপর স্বীয় কল্পনা-কুসুমের সাহায্যে কবি নিজেই অপূর্ব্ব মাল্য রচনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গত এখানে স্মরণ করা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথের শান্তিকামী মন মহাভারতের বিরাট বিপুল কর্ম্মযজ্ঞ অপেক্ষা উহার প্রশান্ত-পরিণতির যে নির্ব্বেদ—

> বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ,
> সফল আশার বিষাদ মহান্,
> উদাস শান্তি করিতেছে দান
> চির মানবের প্রাণে।[২]

১। দ্রষ্টব্য, চিঠিপত্র, ৬ষ্ঠ খণ্ড

২। পুরস্কার : সোনারতরী

—তাহাতেই অধিকতর আকর্ষণ বোধ করিয়াছে।

পুরাতন বস্তুতে নূতন শক্তি ও সৌন্দর্য্য যোজনার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ নিপুণতার কথা বলিতে গিয়া ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন,—

> বাল্মীকির রামায়ণ বা ব্যাসদেবের মহাভারত হইতে রবীন্দ্রনাথ যেখানে যেটুকু গ্রহণ করিয়াছেন সেখানে যে তিনি বাল্মীকি বা ব্যাসদেবের কাব্যাংশের পুনরাবৃত্তিমাত্র করেন নাই তাহা সহজ-বোধ্য; এ গ্রহণের তাৎপর্য্য জীবনের নবলব্ধ বাণীকে অতীত জীবনের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জীবন-রসের 'সামরস্য' আস্বাদন করা। তা ছাড়া মানুষের জীবন-ইতিহাসের অতীত অংশটার একটা রহস্যঘন মহিমা রহিয়াছে, সেই মহিমার উদ্ভাসের উপরে বর্ত্তমানের জীবনও সহজেই মহিমান্বিত হয়। প্রাচীন সাহিত্যকে আমরা নূতন সাহিত্য রচনার জন্য তখনই অবলম্বন করি যখন আমাদের চিত্তের ভিতরে যে একটি বিশেষ জীবন-দর্শন রহিয়াছে প্রাচীন সাহিত্য বা সাহিত্যাংশের দ্বারা আমাদের সেই জীবন-দর্শনের একটা রসময় উদ্বোধ ঘটে। সেই যে রসময় উদ্বোধ তাহা তো কবির নিজস্ব—তাহা সম্পূর্ণ একালের; সুতরাং সেকালের বিষয়-বস্তুর দেহের ভিতরে যে প্রাণসঞ্চারণ ঘটে তাহা একালেরই জিনিস।[১]

আমরা এক্ষণে নাট্যকবিতাগুলির ক্ষেত্রে সেই পরিবর্ত্তন কিভাবে সংঘটিত হইয়াছে এবং উহার ফলাফলের গুরুত্ব কতখানি সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতেছি।

॥ বিদায়-অভিশাপ ॥

দেবতাদের পরামর্শে বৃহস্পতিপুত্র কচ বৃষপর্ব্বার সমীপে উপস্থিত হইয়া দানব-গুরু শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে কচের সঞ্জীবনী-বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে। তাহার বিদায়-লগ্ন সমুপস্থিত। গুরু-কন্যা এবং ব্রত

১। ত্রয়ী (২য় সংস্করণ), ১৪৫ পৃষ্ঠা

উদ্‌যাপনকালীন তাহার একান্ত অনুগত সহচরী দেবযানীর নিকট হইতে কচের বিদায় লইয়া স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বক্ষণের অত্যন্ত বিষাদ-করুণ ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া 'বিদায়-অভিশাপ' রচিত।[১] কিন্তু ঐ মুহূর্ত্তের ঘটনাটিই কবি-মানসের প্রকৃতি ও প্রবণতা অনুযায়ী কিভাবে এক নবরূপ ধারণ করিয়া অসামান্য মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছে, পরবর্ত্তী আলোচনা হইতে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

আবাল্য প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাবান, আরণ্যক সভ্যতার বৈশিষ্ট্যমুগ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথ কচ ও দেবযানীর বিদায় মুহূর্ত্তের বেদনা-বিবশ মনের অতীত স্মৃতিচারণ প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের পরস্পরের আশা-আনন্দ, দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় অতীত জীবন বিবৃতির ভিতর দিয়া সহস্র বর্ষব্যাপী তপোবন জীবন-লীলার এক মনোরম আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন। 'মানসী'-'কল্পনা'র যুগে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রাচীন ভারতের প্রাণপ্রবাহকে স্পর্শ করিবার এমন একটি সুযোগ উপেক্ষা করা যে সহজসাধ্য নহে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সকলেরই জানা থাকিবার কথা যে, 'মানসী'তে ভারতপথিক কবির যাত্রারম্ভ, আর 'কল্পনা'-'নৈবেদ্যে' গন্তব্যে আশ্রয় লাভ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, 'বিদায়-অভিশাপ' সেই বিশিষ্ট যুগেরই সৃষ্টি। অতএব প্রাচীন ভারতীয় তপোবন-জীবন অনুসন্ধিৎসা ইহার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের নহে। আমরা এ সম্পর্কে পরে আরও বিশদভাবে আলোচনা করিব। কবি-কল্পনার এই সময়কার আর একটি প্রধান লক্ষণও ইহাতে চমৎকারভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'কড়ি ও কোমলের' প্রেমমূলক কবিতাগুলির মধ্যে শারীর ও বিদেহ প্রেমের যে দ্বন্দ্ব সাতিশয় ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল সেই দ্বন্দ্ব, সেই সমস্যাই এই নাট্যকবিতাটিরও প্রাণ-স্পন্দন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। প্রেম ও কর্ত্তব্য,—এই দুইয়ের মধ্যে সুমহান কর্ত্তব্যের প্রতি নিগূঢ় আনুগত্য স্বীকারই যে পুরুষের পক্ষে নিঃশ্রেয়স রবীন্দ্রনাথ ইহাতে মুখ্যত তাহাই প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছেন বটে, তথাপি দেখা যায় যে, প্রেমের মাধুর্য্যকেও যৌবনদীপ্ত দুইটি তরুণতরুণীর দেহের আধারে অসীম সৌন্দর্য্যে বিকশিত করিয়া তুলিতে তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই। কচ ও দেবযানীর প্রেম নিতান্তই অধ্যাত্ম-প্রেম নহে, দেহ-বটবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াই ঐ প্রেম-লতিকাটি

১। দ্রষ্টব্য, মহাভারত—আদিপর্ব্ব, সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় : কালীপ্রসন্নসিংহের অনুবাদ

শত আশা ও আনন্দে মঞ্জরিত হইয়াছে। কচের পক্ষে সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও দেবযানীর কাছে যে প্রেমের দেহনির্ভর কামনাই চরম সত্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে তাহা কর্ত্তব্যপরায়ণ কচের নিকট তাহার অন্তরের হাঁহাকার প্রকাশের মধ্য দিয়াই মর্ম্মান্তিকভাবে প্রত্যক্ষগোচর হইয়া উঠিয়াছে। সকল মিনতি ও প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া স্বর্গপুরীতে দেব-সমাজ মধ্যে ফিরিয়া যাইবার জন্য সুদৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ কচকে সম্বোধন করিয়া দেবযানীকে বলিতে শুনি,—

তুমি চলে যাবে স্বর্গলোকে
সগৌরবে, আপনার কর্তব্যপুলকে
সর্ব দুঃখশোক করি দুরপরাহত ;
আমার কী আছে কাজ, কী আমার ব্রত।
আমার এ প্রতিহত নিষ্ফল জীবনে
কী রহিল, কিসের গৌরব। এই বনে
বসে রব নত শিরে নিঃসঙ্গ একাকী
লক্ষ্যহীনা। যেদিকেই ফিরাইব আঁখি,
সহস্র স্মৃতির কাঁটা বিঁধিবে নিষ্ঠুর ;
লুকায়ে বক্ষের তলে লজ্জা অতি ক্রুর
বারম্বার করিবে দংশন।

কিন্তু উপনিষদুক্ত শ্রেয় পন্থায় বিশ্বাসী কবি এইভাবেই প্রেমের অনন্ত মূল্য স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। দেশ ও জাতির প্রতি মানবের যে মহান কর্ত্তব্য উহার কাছে 'নিখিলবিস্মৃত', মুগ্ধ, আত্মকেন্দ্রিক প্রেমের পরাজয় ঘটাইয়া এবং ইংরেজ কবি টেনিসনের অনুসরণে কর্ত্তব্য-চেতনার প্রশস্তি রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্য্যন্ত আদর্শবাদকেই জয়ী করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অভিমানিনী দেবযানীর তিরস্কারের প্রতিবাদে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কচ যখন বলে,—

ভালোবাসি কিনা আজ
সে তর্কে কী ফল। আমার যা আছে কাজ
সে আমি সাধিব। স্বর্গ আর স্বর্গ ব'লে
যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধ মৃগসম,

চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম
সর্ব কার্য-মাঝে—তবু চলে যেতে হবে
সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে। দেব-সবে
এই সঞ্জীবনী বিদ্যা করিয়া প্রদান
নূতন দেবত্ব দিয়া তবে মোর প্রাণ
সার্থক হইবে; তার পূর্বে নাহি মানি
আপনার সুখ

—তখন কবির মূল উদ্দেশ্যটি হৃদয়ঙ্গম করিতে কষ্ট হয় না।

কিন্তু সেই উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ করিতে যাইয়া কবি যে বেশ একটু অসুবিধায় পড়িয়াছেন তাহাও বুঝিতে পারা যায়। উপরের উদ্ধৃতিটির মধ্যে কচের ঋজু ব্যক্তিত্ব, নৈতিক শুচিতা, বলিষ্ঠ সংযমপরায়ণতা ও দৃঢ় কর্ত্তব্য চেতনার পরিচয় অতি সুন্দররূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি আদর্শবাদের উপর অতিরিক্ত জোর পড়ায় মূল কচ চরিত্রের স্বাভাবিকতা যে, কথঞ্চিৎ পরিমাণে হইলেও, নষ্ট হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। রবীন্দ্রনাথের কচ চরিত্রে এমন আদর্শনিষ্ঠা বেমানান। মহাভারতকার কচকে প্রেমিক বলিয়া কল্পনা করেন নাই; সঞ্জীবনী বিদ্যা অর্জ্জন করাই ছিল তাহার একমাত্র অভিলাষ। নৃত্যগীতবাদ্যের দ্বারা মধ্যে মধ্যে শুক্রতনয়া দেবযানীর মনোরঞ্জন তাহাকে করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহাও মূল উদ্দেশ্যের পথের কণ্টক দূর করিবার জন্য। কচ দেবযানীকে স্নেহ করিত। গুরুকন্যা বলিয়া ভগ্নীর ন্যায় স্বাভাবিক সম্ভ্রমবোধও তাহার প্রতি ছিল এবং দানবসমাজের ঈর্ষ্যা ও অত্যাচারে পীড়িত তাহার দুর্ব্বিষহ জীবনকে দেবযানীর সর্ব্বদা সুসহ ও সুন্দর করিয়া তুলিবার প্রযত্নের জন্য উহারই সহিত এক প্রকার কৃতজ্ঞতার বোধও যুক্ত হইয়াছিল। মহাভারতের কচ চরিত্রে ইহার অতিরিক্ত কোন অনুভূতির সন্ধান মিলে না। দেবযানীর প্রতি কচের প্রেমাসক্তির আভাস মাত্রও সেখানে অনুপস্থিত। প্রণয়বিবশা দেবযানীকে সান্ত্বনা দান ছলে তাহাকে বলিতে শুনি,—

হে শুভব্রতে! অন্যায্য বিষয়ে আমাকে নিয়োগ করা উচিত হইতেছে না। হে বালে! তুমি আমার গুরু হইতেও গুরুতরা।

এক্ষণে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে বিশালাক্ষি! তুমি যে শুক্রের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছ, আমি উহারই উদরে বাস করিয়াছিলাম; সুতরাং তুমি ধর্ম্মতঃ আমার ভগিনী হইলে; অতএব এরূপ কথা আর কহিও না। হে ভদ্রে! এতদিন এই স্থানে সুখে বাস করিলাম, এক্ষণে অনুমতি কর, গৃহে গমন করি এবং আশীর্ব্বাদ কর, যেন পথিমধ্যে আমার কোন বিঘ্ন-ঘটনা না হয়। কথা প্রসঙ্গে আমাকে এক একবার স্মরণ করিও এবং সতত সাবধানে আমার গুরু শুক্রাচার্য্যের পরিচর্য্যা করিও।[১]

দানবেরা কচের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য এবং তাহার সুনিশ্চিত অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত কচকে ভস্ম করিয়া সেই ভস্মমিশ্রিত সুরা একদিন শুক্রাচার্য্যকে পান করাইয়া দেয়। দেবযানী জানিতে পারিয়া পিতার কাছে কচের পুনর্জ্জীবন প্রার্থনা করিল। তখন শুক্রাচার্য্য উদরস্থ কচকে সঞ্জীবনী বিদ্যা দান করিয়া তাহার উদ্দেশে বলিলেন, 'তুমি পুত্ররূপে আমার উদর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নবলব্ধ এই সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে আমাকে পুনর্জ্জীবিত কর।' উপরের উদ্ধৃতিটির মধ্যে এই ঘটনারও ইঙ্গিত রহিয়াছে। কিন্তু তাহা ছাড়াও প্রাচীনকালে শিষ্য মাত্রই গুরুর পুত্রস্থানীয় ছিলেন। 'গর্ভের মধ্যে জননী যেমন শিশুকে গ্রহণ করেন, গুরুও তেমনি শিষ্যকে নিজের অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের অধ্যাত্ম সাধনা সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে দ্বিতীয় জন্ম দান করেন। তাই ব্রহ্মচারী মাত্রেই দ্বিজ এবং গুরু পিতৃস্থানীয়। শুধু পিতৃস্থানীয় নয়, শিষ্যের জীবনে গুরুই সব!'[২] কচের আশ্রম-জীবনে এই আদর্শের প্রতিফলনই দৃষ্টিগোচর হয়।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতেই দেবযানীর প্রতি কচের মনোভাব কিরূপ ছিল তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। দেবযানীর সহিত তাহার আর যে-সম্পর্কই থাকুক, প্রেমের সম্পর্ক ছিল না। তাই কর্ত্তব্য-চেতনার একান্ত আনুগত্যে, মানবদুর্লভ চারিত্রিক দৃঢ়তার বলে, কামজ্বালা পীড়িত দেবযানীর

১। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারত: আদিপর্ব্ব, সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়

২। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়: শিক্ষার ভিত্তি, ৪০ পৃষ্ঠা

অভিশাপ-বাণীর উত্তরে তাহাকেও যখন রুষ্ট হইয়া অভিশাপ বর্ষণ করিতে দেখি,—

> হে দেবযানি! আমি তোমাকে আর্ষধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতেছিলাম; তথাপি তুমি আমাকে অভিশাপ দিলে। ফলতঃ আমি শাপের উপযুক্ত নহি এবং তোমার এই শাপও ধর্ম্মতঃ নহে, কামতঃ; অতএব আমি তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিতেছি, তুমি যাহা অভিলাষ করিতেছ, তাহা নিষ্ফল হইবে এবং অন্য কোন ঋষিকুমারও তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন না।[১]

—তখন আমরা মোটেই বিস্মিত হই না। বরং চরিত্রের মহাকাব্যীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাভাবিকতা অটুট রহিয়াছে বলিয়াই মনে করি।

রবীন্দ্রনাথ কচকে এই অভিশাপ বর্ষণের গ্লানি হইতে মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার 'বিদায়-অভিশাপে'র আকাশ এককভাবে দেবযানীর হৃদয়-বেদনা মথিত অভিশাপ-বাণীতেই বিদীর্ণ। সম্ভবত এই কারণেই এই নাট্যকবিতাটির কথাবস্তুর পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন,—'মহাভারতের সহিত একটুখানি অনৈক্য আছে, কিন্তু সে সামান্য'।[২] রবীন্দ্রনাথ ব্যর্থ-বাসনা দেবযানী প্রদত্ত অভিশাপের শাণিত শর তাহার বিস্তৃত বক্ষে ধারণ করাইয়াও কচকে দিয়া স্বচ্ছন্দ কণ্ঠেই বলাইয়াছেন,—

> আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে
> ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।

ফলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বটে যে, কচের চরিত্র জুড়িয়া অনেকখানি নূতন মহিমা দেখা দিয়াছে; কিন্তু তাহার সবখানিই যে বাস্তবানুগ হয় নাই একটুখানি তলাইয়া দেখিলেই তাহা চোখে পড়ে। যাঁহারা মহাভারতের কচ অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের কচকে উন্নত বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের অবগতির জন্য বলিতে চাই যে, ব্যাস ও রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজন ভিন্ন এবং সেই বিভিন্নতা হইতেই এই পার্থক্যের উদ্ভব। তাহা ছাড়া, মহাভারতের বিরাট যজ্ঞভূমিতে

১। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারত: আদিপর্ব্ব, সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়
২। কাব্যের তাৎপর্য: পঞ্চভূত

কচ ও দেবযানীর ভূমিকা নগণ্য না হইলেও সমগ্রের সামান্য অংশ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ ঐ সামান্যকে লইয়াই এক পরিপূর্ণ ভাব-বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিতে চাহিয়াছেন। কাজেই প্রয়োজন বোধেই উহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন যে সর্ব্বতোভাবে সার্থক হইয়াছে এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথ কচ চরিত্রে মহাভারতের স্বাভাবিকতা এবং কার্য্যকারণসূত্রের নিবিড় বন্ধন সর্ব্বত্র অটুট রাখিতে পারেন নাই। উৎকর্ষ সাধনের জন্য সিদ্ধ-চরিত্রের পরিবর্ত্তনও অনেক সময় অনভিপ্রেত নহে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ ক্ষেত্রে কতখানি সার্থক হইয়াছেন তাহা বিচার-সাপেক্ষ। কচের চরিত্র পরিকল্পনায় তিনি যে নূতনত্বের আশ্রয় লইয়াছেন, তাহার মূল হইল, তাহার মধ্যে এক প্রেমময় হৃদয়ের আবিষ্কার। মহাভারতের কচের কোন দ্বন্দ্ব ছিল না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কচের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। সে-দ্বন্দ্ব বাঁধিয়াছিল একদিকে দেবযানীর প্রতি প্রেমনিবিড় আসক্তি এবং অন্যদিকে মহত্তম কর্ত্তব্যের প্রতি আত্যন্তিক আনুগত্যের মধ্যে। এই সংগ্রামে শেষ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য-চেতনার স্থিরসঙ্কল্পই জয়ী হইলেও তাহার হৃদয় কিরূপ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল সে-প্রমাণ তাহার নিজের উক্তির মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। এস্থলে ১৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত কচের উক্তিটি স্মরণ করা যাইতে পারে। উহার মধ্যে প্রেমিক কচের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার পর স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে,—এমন জোর করিয়া যাহাকে প্রেমের কণ্ঠরোধ করিতে হয় তাহার পক্ষে মন-প্রাণ-চিত্তের সমস্ত শক্তিকে কোন বিরাটতর ও মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত করা কি সম্ভব? দেবযানী অভিশাপ না দিলেই কি কচ সিদ্ধকাম হইতে পারিত? প্রেমের অভিশাপ বলিয়া কি কিছুই নাই? প্রেমের প্রসন্ন দৃষ্টিপাত যেমন দীনতমের ললাটেও মহিমার রাজটিকা পরাইয়া দেয়[১] তেমনি উহার ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষে কি স্পর্দ্ধিততমের দর্পও চূর্ণ হইয়া যাইবার কথা নয়? আমাদের তো মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কচের পক্ষে তাহার আপন অন্তরের প্রেমের অভিশাপই বক্ষপঞ্জর চূর্ণবিচূর্ণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট, দেবযানীর অভিশাপ এ ক্ষেত্রে নিতান্তই একটা বাহ্য রূপক মাত্র। বিদগ্ধ রবীন্দ্র-সমালোচক প্রমথ নাথ বিশীর মন্তব্যের মধ্যেও ইহার সমর্থন মিলিবে। তিনি তাঁহার 'বিদায়-অভিশাপে'র আলোচনায় লিখিয়াছেন,—

১। দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ : চিত্রা : প্রেমের অভিষেক

দেবযানী কচকে অভিশাপ দিয়াছে যে সে সঞ্জীবনীবিদ্যা শিখাইতে পারিবে, প্রয়োগ করিতে পারিবে না, কিন্তু এ অভিসম্পাতের কোন প্রয়োজন ছিল না। সঞ্জীবনীবিদ্যা যদি নব-জীবন লাভের বিদ্যা হয়, জীবনের আনন্দকে পুনরায় লাভের বিদ্যা হয়, কচ কি আর স্বর্গে ফিরিয়া গিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিবে? তাহার যে জীবনটা এখানে তপোবন তরুতলে ছায়ার চেয়েও ম্লান হইয়া পড়িয়া রহিল তাহাকে কচ কি আর সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে? বিরহবেদনায় ভস্মীকৃত জীবনকে আর কি সে আনন্দলোকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারিবে? নিজের হৃদয়ের প্রতি নিজের আয়ত্ত বিদ্যা প্রয়োগের ক্ষমতা আর তাহার রহিল না।[১]

নারীপুরুষের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে একদা কবি যাহা বলিয়াছিলেন এখানে তাহাও উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন,—

আমরা অকর্মণ্য নিষ্ফল নিশ্চল বালুকারাশি স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছি, প্রত্যেক সমীর শ্বাসে হু হু করিয়া উড়িয়া যাইতেছি এবং যে কোন কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি তাহাই দুই দিনে ধসিয়া ধসিয়া পড়িয়া যাইতেছে। আর আমাদের বামপার্শ্বে আমাদের রমণীগণ নিম্নপথ দিয়া বিনম্র সেবিকার মত আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া স্বচ্ছ সুধাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে। তাহাদের এক মুহূর্ত বিরাম নাই। তাহাদের গতি, তাহাদের প্রীতি, তাহাদের সমস্ত জীবন এক ধ্রুব লক্ষ্য ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। আমরা লক্ষ্যহীন, ঐক্যহীন, সহস্র পদতলে দলিত হইয়াও মিলিত হইতে অক্ষম। যেদিকে জলস্রোত, যেদিকে আমাদের নারীগণ, কেবল সেইদিকে সমস্ত শোভা, ছায়া এবং সফলতা, এবং যেদিকে আমরা, সেদিকে কেবল মরু চাকচিক্য, বিপুল শূন্যতা এবং দগ্ধ দাস্যবৃত্তি।[২]

১। রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ, প্রথম খণ্ড, (১ম সংস্করণ) ১৭ পৃষ্ঠা

২। নরনারী : পঞ্চভূত। 'ছিন্নপত্রে'র ৯৫-সংখ্যক পত্রটিও এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য

প্রেমময়ী, স্নেহময়ী, সেবাপরায়ণা দেবযানীর সাহচর্য্য উপেক্ষা করিয়া কচের জীবন জুড়িয়া তেমনই এক মহামরুর বিপুল শূন্যতা কি দেখা দিবে না? নর ও নারীর পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য ও পুরুষের জীবনে রমণীর দুর্নিবার প্রভাবের কথা রবীন্দ্রনাথ উপরে যেভাবে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাঁহারই সমসাময়িক অপর একজন কবি সেই কথাই শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক কল্পনার গুরুত্ব সহকারে বুঝাইতে গিয়া লিখিয়াছেন,—

নারী,

তুমি বিধাতার স্ফূর্ত্তি, কঠোরে কোমল মূর্ত্তি,
শুষ্ক জড় জগতের নিত্য-নব ছলা;
উপচয়ে দশহস্তা, অপচয়ে ছিন্নমস্তা,
মায়াবদ্ধা, মায়াময়ী, সংসার-বিহ্বলা!

তুমি স্বস্তি-শান্তি-দাত্রী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী,
সৃজয়িত্রী, পালয়িত্রী, ভব-দুঃখহরা;
আত্মমধ্যা স্বয়ংস্থিতা, সুন্দরে অপরাজিতা,
মুগ্ধা, আশ্লেষরূপা, বিশ্লেষ-কাতরা!

আমি জগতের ত্রাস, বিশ্বগ্রাসী মহোচ্ছ্বাস,
মাথায় মত্ততা-স্রোত, নেত্রে কালানল,
শ্মশানে মশানে টান, গরলে অমৃত-জ্ঞান,
বিষ-কণ্ঠ, শূল-পাণি, প্রলয়-পাগল!

তুমি হেসে ব'সে বামে সাজাইয়া ফুলদামে
কুৎসিতে শিখালে শিবে, হইতে সুন্দর;
তোমারি প্রণয়-স্নেহ বাঁধিল কৈলাস-গেহ,
পাগলে করিল গৃহী, ভূতে মহেশ্বর![১]

১। অক্ষয়কুমার বড়াল: প্রদীপ

এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে বৎসর তিনেক পূর্ব্বে রচিত 'রাজা ও রাণী' কাব্যনাট্যের রাজা বিক্রম ও রাণী সুমিত্রার দ্বন্দ্বের কথা। প্রেম ও কর্ত্তব্যের বিরোধের পথেই সেখানেও নাট্য-সংঘাত দেখা দিয়াছে। বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দিতে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধা এবং কঠোর কর্ত্তব্য-পরায়ণা রাণী কর্ত্তৃক রাজার সুনিবিড় প্রেমালিঙ্গনকে প্রত্যাখ্যান বিক্রমের অন্তরে যে রোষাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল তাহার দাহে একটা গোটা রাজ্য শ্মশানে পরিণত হইয়া গেল। সুমিত্রার সর্ব্বস্ব ত্যাগের ভিতর দিয়াও উহার অন্যথা ঘটান সম্ভব হইল না। প্রবল প্লাবনের মুখে বালির বাঁধের ন্যায় কামনাতাড়িত রাজার হা-হুতাশে সুমিত্রার কর্ত্তব্য-চেতনার সুফল নিমেষে বিলীন হইয়া গেল। প্রেমানুভূতি কর্ত্তব্য সাধনের অন্তরায় না হইয়া কিভাবে মহত্তম ও সুকঠোর ব্রত উদ্‌যাপনের অনুপ্রেরণা হইয়া উঠে, উভয়ের সার্থক মিলনে চারিত্রিক মহিমার কি অপূর্ব্ব বিকাশ ঘটে, বাংলা সাহিত্যে তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-বর্ণিত প্রমোদ উদ্যানে প্রমীলার নিকট হইতে মেঘনাদের বিদায় গ্রহণ দৃশ্যটির কথা। সেই দৃশ্যটি একাধারে প্রেম ও বীর্য্য, ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বার্থ ভাবনার নির্ব্বিরোধ মিলন মাধুর্য্যে অনুপম রস-শ্রী ধারণ করিয়াছে।

॥ গান্ধারীর আবেদন ॥

দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব বন-গমনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। সেই অশুভ বিষাদাচ্ছন্ন মুহূর্ত্তে নারীর লাঞ্ছনা অপমানকারী অধর্ম্মাচারী দুষ্টমতি পুত্র দুর্য্যোধনের বিরুদ্ধে রাজমাতা গান্ধারী অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন। স্নেহান্ধ রাজা সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করার অসামর্থ্য প্রকাশ করিলে অনন্যোপায় গান্ধারী ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা হেতু প্রলয়ের দেবতাকেই শেষ পর্য্যন্ত জাগ্রত হইবার জন্য আকুল প্রার্থনা জানাইয়াছেন। 'গান্ধারীর আবেদনে'র প্রধান কাহিনী অংশ ইহাই; উহার ঐরূপ নামকরণের হেতুও সম্ভবত তাহাই। কিন্তু গান্ধারীর আবেদন-নিবেদন এবং ধৃতরাষ্ট্রের পরিতাপ-অনুশোচনাশ্রিত সন্তান-স্নেহ এই নাট্যকবিতার মূল কাহিনী-ভাগ রচনা করিলেও উহার পূর্ব্বে এবং পরে আরও দুইটি অংশের সংযোজনা চোখে পড়ে। নিঃসন্দেহে প্রথমটিকে 'ধৃতরাষ্ট্র-দুর্য্যোধন সংবাদ' এবং শেষটিকে 'গান্ধারী-ভানুমতী-যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদী সংবাদ' বলা যাইতে পারে। একই ভাবমুখী

একাধিক সনেটের পারম্পর্য্য (sonnet sequence) সাধন দ্বারা যেমন উপজীব্য বিষয়টির গুরুত্ব বৃদ্ধি ও স্পষ্টতা আনয়ন করা যায় এখানেও যেন ঐ উপায়ে অনুরূপ এক সাহিত্যিক সিদ্ধি ঘটাইবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহার ফলে কাহিনীর ঐ স্বল্পায়তনের মধ্যেও ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী চরিত্রের অভিব্যক্তিতে অনেকটা পূর্ণতা দেখা দিয়াছে এবং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্লট গড়িয়া উঠিয়াছে। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ছাড়া এমন সুসংহত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্লট কল্পনা অন্য কোন নাট্যকবিতায় নাই।

মহাভারতে দেখা যায় দ্বিতীয়বার দ্যূত ক্রীড়ার আয়োজনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে গান্ধারী দুর্য্যোধনকে ত্যাগ করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র সকাশে এইভাবে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন,—

> অনন্তর শোকনিমগ্না ধর্ম্মপরায়ণা গান্ধারী পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তিনী হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, "মহারাজ! দুর্য্যোধন জন্মগ্রহণ করিলে মহামতি বিদুর কহিয়াছিলেন, 'এই কুলপাংশুল শিশুকে অবিলম্বে সংহার কর, মঙ্গল হইবে।' আর দুর্য্যোধন জাত মাত্র গর্দ্দভের ন্যায় চীৎকার করিয়াছিল। দুর্য্যোধন আমাদিগের কুলান্তক। ফলতঃ এক্ষণে আপনি আত্মদোষে বিপদ্-সাগরে নিমগ্ন হইবেন না, দুর্ব্বিনীত বালকের কথা কদাচ অনুমোদন করিবেন না। এই ঘোরতর কুলক্ষয়কর বিষয়ে কেন হস্তার্পণ করিতেছেন?……এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে আপনি ঐ কুলপাংশুল দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করুন। হে নরনাথ! আপনি পুত্রবৎসলতাবশতঃ তৎকালে বিদুর বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারই কুলান্তক ফল উপস্থিত হইয়াছে। শান্তি, ধর্ম্ম ও মন্ত্রিবর্গের পরামর্শানুসারে আপনার যেরূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহা যেন অবিকৃতভাবেই থাকে; অসমীক্ষ্যকারিতা আপনার নিতান্ত দোষাবহ। দেখুন ক্রূর হস্তে নিপতিতা হইলে রাজলক্ষ্মী ক্ষণবিধ্বংসিনী হয়; কিন্তু সরলের রাজশ্রী পুরুষ পরম্পরাক্রমে পুত্রপৌত্রগামিনী হইয়া থাকে।[১]

১। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুদিত মহাভারত : সভাপর্ব্ব, পুনর্ব্বার দ্যূত ক্রীড়ার সূচনায়

এই ঘটনাটিই রবীন্দ্রনাথের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। মহাভারতের অপর একটি ঘটনার—দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবের বনযাত্রার প্রাক্কালে বিদুর ও কুন্তীর আশীর্ব্বাদ বর্ষণের[১] সাদৃশ্যে আলোচ্য নাট্যকবিতার শেষাংশের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। উদ্‌যোগ পর্ব্বের অন্তর্গত ভগবদ্‌যান পর্ব্বাধ্যায়ের ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-দুর্য্যোধন সংবাদের পটভূমিকায় প্রথমাংশটুকু পরিকল্পিত হইয়াছে। তথাপি এই বিচিত্র কাহিনী গ্রন্থনে রবীন্দ্রনাথ যেরূপ স্বকীয়তার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে ইহা একরূপ নবসৃষ্টিরই মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে এবং কবির নিপুণ নির্ম্মাণ কৌশলের আদর্শ দৃষ্টান্তস্থল হইয়া উঠিয়াছে।

'গান্ধারীর আবেদনে'র প্রধান চরিত্র তিনটি—ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন ও গান্ধারী। ধৃতরাষ্ট্র চরিত্র মূল মহাভারত হইতে প্রায় অভিন্ন। মূলানুযায়ীই তাঁহার মধ্যে ন্যায়ধর্ম্ম ও বাৎসল্যের দ্বন্দ্ব এবং দৈবপরবশতা প্রভৃতি লক্ষণ অটুট রাখিয়া তাঁহার স্নেহাপ্লুত, পরিতাপ-জর্জ্জর চিত্তের দোদুল্যমানতা দক্ষ শিল্পীর ন্যায় অতি বিরল রেখাপাতে ধীরে ধীরে কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্রের অপরিসীম সন্তান-স্নেহ অনুপম ভাষায় ও ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। শত পুত্রের জনক হইয়াও, আত্মীয়-পরিজন, এমন কি, যোগ্যতমা সহধর্ম্মিণীর বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি অপরাধপ্রবণ দুর্য্যোধনকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। এমন বিমূঢ় স্নেহাধিক্যের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্যে সচরাচর দেখা যায় না। ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যপাল, ধর্ম্মজ্ঞ, সর্ব্বোপরি মহাজ্ঞানী পুরুষ। ন্যায়ধর্ম্ম ও রাজধর্ম্মে তাঁহার জ্ঞানের খর্ব্বতা ছিল না; দুর্য্যোধনের সহিত কথোপকথন কালে সে-পরিচয় তিনি সার্থকভাবেই দিয়াছেন। তথাপি ধর্ম্ম, বিবেক, যুক্তি, নীতিবোধ কিছুকেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্নেহের কাছে এমন অবশ আত্মসমর্পণ সত্যই বড় আশ্চর্য্যের। তাঁহার এই বিমূঢ়তার ভাবটি নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে চমৎকারভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ন্যায় উপদেশে রুষ্ট, অভিমানী পুত্রের মনোবেদনা প্রশমিত করিবার জন্য আপন হৃদয়-দ্বার অবারিত করিয়া তাহার সম্মুখে স্নেহের সর্ব্বধ্বংসী করাল মূর্ত্তিটি তুলিয়া ধরিবার ছলে তিনি বলিতেছেন,—

হায় বৎস, অভিমানী। পিতৃস্নেহ মোর
কিছু যদি হ্রাস হ'ত শুনি সুকঠোর

১। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুদিত মহাভারত : সভাপর্ব্ব, পাণ্ডবগণের বনযাত্রা

সুহৃদের নিন্দাবাক্য, হইত কল্যাণ।
অধর্মে দিয়েছি যোগ, হারায়েছি জ্ঞান,
এত স্নেহ। করিতেছি সর্বনাশ তোর,
এত স্নেহ। জ্বালাতেছি কালানল ঘোর
পুরাতন কুরুবংশ মহারণ্যতলে--
তবু পুত্র, দোষ দিস্ স্নেহ নাই ব'লে?
মণিলোভে কালসর্প করিলি কামনা,
দিনু তোরে নিজ হস্তে ধরি তার ফণা
অন্ধ আমি।—অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে
চিরদিন,—তোরে লয়ে প্রলয়তিমিরে
চলিয়াছি,—বন্ধুগণ হাহাকার-রবে
করিছে নিষেধ, নিশাচর গৃধ্র-সবে
করিতেছে অশুভ চীৎকার, পদে পদে
সংকীর্ণ হতেছে পথ, আসন্ন বিপদে
কণ্টকিত কলেবর, তবু দৃঢ় করে
ভয়ংকর স্নেহে বক্ষে বাঁধি লয়ে তোরে
বায়ুবলে অন্ধবেগে বিনাশের গ্রাসে
ছুটিয়া চলেছি মূঢ় মত্ত অট্টহাসে
উল্কার আলোকে—শুধু তুমি আর আমি,
আর সঙ্গী বজ্রহস্ত দীপ্ত অন্তর্যামী—
নাই সম্মুখের দৃষ্টি, নাই নিবারণ
পশ্চাতের, শুধু নিম্নে ঘোর আকর্ষণ
নিদারুণ নিপাতের।

এখানে ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরের মর্ম্মান্তিক দ্বন্দ্ব-চিত্রটি অপূর্ব্ব দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হইয়াছে। দুর্য্যোধন পাপাচারী এবং বিধাতার রোষদৃষ্টিপাতে সেই পাপের পরিণাম একদা অতিশয় ভয়াবহ ও শোচনীয় হইয়া উঠিবে জানিয়াও তিনি স্নেহের সহজ দাবিকে কোন প্রকারেই খর্ব্ব করিতে পারিতেছেন না। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলের হিত-কথা উপেক্ষা করিয়া পাপী পুত্রকে বক্ষে আশ্রয় দিয়া নিশ্চিত ধ্বংসের মুখেই আগাইয়া চলিয়াছেন। এই আত্মক্ষয়ী

দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়াই—একদিকে পুত্রের প্রতি অপরিমেয় স্নেহ, অন্যদিকে ধর্ম্ম-বিশ্বাস,—তাঁহার চরিত্রে ট্র্যাজিক-সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। নাট্যকবিতার সূক্ষ্ম রসাবেদন পুরাপুরি বজায় রাখিয়া কোন চরিত্রে ট্র্যাজিক সুর সৃষ্টি করা এক প্রকার দুরূহ কর্ম্ম। রবীন্দ্রনাথ ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রে সেই দুর্লভ সিদ্ধি যথেষ্ট সার্থকতার সঙ্গে অর্জ্জন করিয়াছেন।

হৃদয়ধর্ম্মের উপর বড় বেশী জোর দিতে গিয়া ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত দৈবপরবশও হইয়া উঠিয়াছিলেন। গান্ধারীর সহিত কথোপকথন কালে সেই দৈব-নির্ভরতা অত্যন্ত প্রত্যক্ষগোচর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, জ্ঞানীপুরুষের মুখে যখন শুনি,—

—ঘটেছে যা ছিল ঘটিবার,
ফলিবে যা ফলিবার আছে।

—তখন বিস্ময় বোধ না করিয়া পারা যায় না। তাঁহার মধ্যে দৈবানুগত্য স্নেহাধিক্যের মতই অতিশয় প্রবল ছিল। অন্তর্দ্বন্দ্বে অবিরাম ক্ষতবিক্ষত হইয়া ক্লান্ত বুদ্ধি-মন এই দৈব-নির্ভরতাতেই যেন শেষ আশ্রয় পাইয়াছিল। পুত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্য সকলের দ্বারা নিন্দিত হইয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি এই অভিনব উপায়টি আবিষ্কার করিয়া উহাকেই শেষ আশ্রয় করিয়াছিলেন।

প্রবল স্নেহানুগত্যবশত যথোপযুক্তভাবে ধর্ম্মরক্ষায় অসামর্থ্যই ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ সে-বৈশিষ্ট্য অটুট রাখিয়াও এই চরিত্র সৃষ্টিতে আপন প্রতিভার প্রদীপ্ত স্বাক্ষর অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সামান্য কয়েকটি মাত্র সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি এমনভাবেই আমাদের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন যাহার ফলে মনে হয় 'He is a living man not merely a self described personage'. তাঁহার স্নেহবিবশ চিত্তের ভয়াবহ পরিণতির কথা ভাবিয়া আমরা যেমন বিস্মিত ও বিমূঢ় হই, তেমনি আবার তাঁহার প্রতি সহানুভূতিতে আমাদের অন্তঃকরণ ভরিয়া উঠে; তাঁহাকে আমাদেরই একজন ভাবিতে পারিয়া চিত্ত-প্রসাদ লাভ করি। রবীন্দ্রনাথ ধৃতরাষ্ট্রের এক অপূর্ব্ব বাস্তবসম্মত জীবন্ত মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাঁহার সাহিত্য চিত্রশালাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

মুখ্যত মহাভারতের উপাদান লইয়া হইলেও রবীন্দ্রনাথ দুর্যোধনের আচরণের প্রায় সম্পূর্ণ এক নূতন ভাষ্য দান করিয়াছেন। দুর্যোধনকে এই নাট্যকবিতায় যে রূপে পাওয়া যায় মূলের তুলনায় উহা যথেষ্ট উন্নত না হইলেও, বেশ সজীব, সতেজ ও স্বাভাবিক হইয়াছে। দীর্ঘ দিনের সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া মাইকেল মধুসূদন যেমন ভক্তি-প্রীতির সমস্ত উপচার দিয়া রাবণের এক নবতন মূর্ত্তি গঠন করিয়া সারস্বত-মন্দিরে উহার চিরন্তন প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি দুর্যোধনকে ধিক্কৃত অবজ্ঞার অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়া মানব-প্রীতির আনন্দলোকে স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

দুর্যোধনের চরিত্র নির্দ্বন্দ্ব। বীর্য্য, ব্যক্তিত্ব ও বিরাট কামনাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ত্যাগের পথে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া মহত্ত্ব অর্জ্জন স্পৃহা তাঁহার ছিল না। এমন কি, সুখ সন্ধান অপেক্ষাও 'ঈর্ষ্যাসিন্ধু-মন্থনসঞ্জাত জয়রস' পান করাকেই তিনি জীবনের পরম কাম্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। লোকধর্ম্ম বা ন্যায়ধর্ম্মে তাঁহার কোন আস্থা প্রকাশ পায় নাই; রাজধর্ম্মই ছিল তাঁহার একান্ত আশ্রয়। এই রাজধর্ম্মও উদার আদর্শের অনুকূল পবিত্রতা ও ঔদার্য্যমণ্ডিত নয়, শাঠ্য, কপটতা, ঈর্ষ্যা ও অহমিকা ভাবনায় অত্যন্ত হীন, সঙ্কুচিত ও কলুষিত ছিল; জয়গৌরবে আপন মাহাত্ম্য ঘোষণাই ইহার একমাত্র লক্ষ্য। এবং এই জয়গৌরব অর্জ্জনের জন্য দুর্যোধন প্রেমের পথ নয়, কঠোর শাসন ও পীড়নের পথই স্বেচ্ছায় বাছিয়া লইয়াছিলেন। নিম্নের পংক্তিগুলি হইতে দুর্যোধন-আচরিত রাজধর্ম্মের স্বরূপ সহজেই উপলব্ধি করা যাইবে। পিতার উপদেশ বাক্যে ক্ষুব্ধ হইয়া দুর্যোধন বলিতেছেন,—

সুখে ছিনু, পাণ্ডবের জয়ধ্বনি যবে
হানিত কৌরবকর্ণ প্রতিধ্বনিরবে।
পাণ্ডবের যশোবিম্বপ্রতিবিম্ব আসি
উজ্জ্বল অঙ্গুলি দিয়া দিত পরকাশি
মলিন কৌরবকক্ষ। সুখে ছিনু পিতঃ,
আপনার সর্বতেজ করি নির্বাপিত
পাণ্ডবগৌরবতলে স্নিগ্ধশান্তরূপে,
হেমন্তের ভেক যথা জড়ত্বের কূপে।
আজি পাণ্ডুপুত্রগণে পরাভব বহি

বনে যায় চলি—আজ আমি সুখী নহি,
আজ আমি জয়ী।

ভুলিতে পারি নে সে যে,
এক পিতামহ তবু ধনে মানে তেজে
এক নহি। * * * * * *
আজ দ্বন্দ্ব ঘুচিয়াছে—আজ আমি জয়ী,
আজ আমি একা।

লোকধর্ম রাজধর্ম এক নহে, পিতঃ।
লোকসমাজের মাঝে সমকক্ষ জন
সহায়সুহৃদ্‌রূপে নির্ভর বন্ধন—
কিন্তু রাজা একেশ্বর ; সমকক্ষ তার
মহাশত্রু, চিরবিঘ্ন, স্থান দুশ্চিন্তার,
সম্মুখের অন্তরাল, পশ্চাতের ভয়,
অহর্নিশি যশঃশক্তি গৌরবের ক্ষয়,
ঐশ্বর্যের অংশ-অপহারী। ক্ষুদ্র জনে
বল ভাগ ক'রে লয়ে বান্ধবের সনে
রহে বলী ; রাজদণ্ড যত খণ্ড হয়
তত তার দুর্বলতা, তত তার ক্ষয়।
একা সকলের ঊর্ধ্বে মস্তক আপন
যদি না রাখিবে রাজা, যদি বহুজন
বহুদূর হতে তাঁর সমুদ্ধত শির
নিত্য না দেখিতে পায় অব্যাহত স্থির,
তবে বহুজন-'পরে বহু দূরে তাঁর
কেমনে শাসনদৃষ্টি রহিবে প্রচার।
রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই,

শুধু জয়ধর্ম আছে, মহারাজ—তাই
আজি আমি চরিতার্থ, আজি জয়ী আমি ;
সম্মুখের ব্যবধান গেছে আজি নামি
পাণ্ডব গৌরবগিরি পঞ্চচূড়াময়।

প্রীতি নাহি পাই
তাহে খেদ নাহি—কিন্তু স্পর্দ্ধা নাহি চাই,
মহারাজ। প্রীতিদান স্বেচ্ছার অধীন,
প্রীতিভিক্ষা দিয়ে থাকে দীনতম দীন—
সে প্রীতি বিলাক তারা পালিত মার্জারে,
দ্বারের কুক্কুরে আর পাণ্ডব ভ্রাতারে ;
তাহে মোর নাহি কাজ। আমি চাহি ভয়,
সেই মোর রাজপ্রাপ্য—আমি চাহি জয়
দর্পিতের দর্প নাশি।

দুর্য্যোধন আশ্রিত এই দাম্ভিক, গর্ব্বোদ্ধত, স্বৈরশাসনমূলক রাজধর্ম্মের সহিত ভারতবর্ষের পরিচয় নূতন নহে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রোক্ত রাজধর্ম্মের মধ্যেও ইহার সমর্থনের অভাব নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভিন্নতর আদর্শে বিশ্বাসী। কূট নীতি ও দমন নীতি অপেক্ষা প্রেমের পরশধন্য উদারতর ন্যায়ধর্ম্মকেই তিনি রাজন্যবর্গের তথা শাসকশ্রেণীর অনুসরণীয় বলিয়া মনে করিতেন। ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এককভাবে তিনি রাষ্ট্রচেষ্টাকে গৌরব দান করেন নাই। তাঁহার মতে রাষ্ট্রচেষ্টা ভারতবর্ষে আপনাকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়াছিল।'[১] তাঁহার সেই ধারণার পরিচয় এই নাট্যকবিতায় গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের উক্তির মধ্যেও রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, তাঁহার নিম্নলিখিত কাব্যপংক্তিগুলিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।—

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি,

১। ধর্মপদং : প্রাচীন সাহিত্য

ধরিতে দরিদ্র বেশ ; শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয় পরাজয় শর সংহরিতে। [১]

অথবা,—

পূরবীতে ধরি তান এক মনে রচি গান
গাহিতে লাগিলা রামদাস,
'আমারে রাজার সাজে বসায়ে সংসার-মাঝে
কে তুমি আড়ালে কর বাস !
হে রাজা, রেখেছি আনি তোমারি পাদুকাখানি,
আমি থাকি পাদপীঠতলে।
সন্ধ্যা হয়ে এল ওই, আর কত বসে রই
তব রাজ্যে তুমি এসো চলে।' [২]

রবীন্দ্রনাথের ধারণানুযায়ী ভারতবর্ষে রাজার ভূমিকা এই প্রতিনিধিরই ভূমিকা,—তিনি পররাজ্যলোভী, প্রজা-উৎপীড়ক, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ শাসক নহেন, রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণকামী, কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রজারঞ্জক সেবক মাত্র। এখানে প্রসঙ্গত ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বান্তর্গত রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্বাধ্যায়ে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মুখেও রাজধর্ম্মের প্রায় অনুরূপ আদর্শের কথাই উচ্চারিত হইয়াছে।

যে ধর্ম্ম আত্মার ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম মানবকে মনের মানুষ খোঁজ করিতে প্রবৃত্তি দান করে, যে ধর্ম্মের সমস্ত প্রয়াস মনুষ্যত্বের অনুগামী এবং যাহা সঙ্কীর্ণ গৃহ-প্রাচীরের বাহিরে আনিয়া মানুষকে বিরাট বিশ্বলোকের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেয় সেই ধর্ম্মের মাপকাঠির বিচারে ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্য্যোধন খুব উন্নত চরিত্রের নহেন। সেদিক হইতে তাঁহাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি থাকিবারও কথা নহে। কিন্তু, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তেরই পরিচয় পাইতেছি। সৃষ্টির মুহূর্ত্তে চরিত্র দুইটি তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রাণ-লীলার প্রাবল্য ও অভিনবত্ব দিয়া কবিসত্তাকে এমনভাবেই আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে, তিনি আর শেষ পর্য্যন্ত আপন আদর্শ-বিশ্বাসে অবিচল

১। ৯৪-সংখ্যক কবিতা : নৈবেদ্য
২। প্রতিনিধি : কথা ও কাহিনী।

থাকিতে পারেন নাই। এই চরিত্র দুইটির প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববোধ ন্যায়ধর্ম্মে তাঁহার যে অকুণ্ঠ সমর্থন, তাহাকে বিচলিত করিয়া চিরন্তন challenge-রূপেই যেন প্রকাশ পাইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্রের নীতি-আদর্শের তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ স্নেহ-বারিধির চিত্রটি এবং দুর্য্যোধনের ন্যায়ভীত ঈর্ষ্যাপুলকিত মূর্ত্তিটি এমন স্বাভাবিকতার সঙ্গে এবং নিখুঁত পারিপাট্যে অঙ্কিত হইয়াছে যে উঁহারা আমাদের সমর্থন ও সহানুভূতি বেশ জোরের সঙ্গেই দাবি করে। বরং মাটির বড় কাছাকাছি বলিয়া আমাদের হৃদয় ক্ষেত্রে তাঁহাদের দাবির পরিমাণও অনেক প্রশস্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকবিতাগুলির মধ্যে আরও দুইটি পিতার চরিত্র আছে—'নরকবাসে' সোমক, 'সতী'তে বিনায়ক রাও। ধৃতরাষ্ট্র তুলনায় ইঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর আকর্ষণ সৃষ্টি করিতে তো সমর্থ হইয়াছেনই, উপরন্তু, তাঁহার বিমূঢ় পিতৃ-হৃদয় লইয়া রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টির মধ্যেই তিনি একক মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধন উভয়েই রবীন্দ্রনাথের চিত্ত-করুণাসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া নব-প্রাণে উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছেন। যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী প্রমুখের রচনায় দুর্য্যোধনের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তাহার অনেকটাই রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ। তবে যতীন্দ্রমোহনের কাব্যে দুর্য্যোধন যে প্রজাবৎসল শাসনকর্ত্তারূপে চিত্রিত হইয়াছেন,—'মানী পেত মান, গুণী আহ্বান, অর্থী ফিরিত অর্থ লভি'।'— রবীন্দ্রনাথের দুর্য্যোধন চরিত্রে তাহার বিপরীত চিত্রই উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। মহাভারতেও দুর্য্যোধনের প্রজাবৎসল স্বভাবের পরিচয় রহিয়াছে। শক্তিদম্ভের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই বিশেষ গুণটির প্রতি অজ্ঞাতসারে কতকটা অবিচার করিয়াছেন। পরাধীন জাতির প্রতিনিধি হিসাবে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ-শাসনের যে ভয়াবহ রূপ তিনি চতুর্দ্দিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাঁহার দুর্য্যোধন চরিত্র-পরিকল্পনায় উহার কিছুটা ছায়া পড়িয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ 'গান্ধারীর আবেদনের' ইংরেজী অনুবাদের সময়ে কবি দুর্য্যোধনের আত্মদম্ভী, প্রজাপীড়ক রূপটির অনেকখানি সংশোধন করিয়াছিলেন।[১]

মহাভারতের মহারণ্যে গান্ধারী বিরাট মহীরুহের ন্যায় বহু শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া উন্নত শীর্ষে বর্ত্তমান। ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম্মবোধ,

১। দ্রষ্টব্য, E. Thompson: Rabindra Nath Tagore

স্বজনবাৎসল্য প্রভৃতি অসংখ্য দুর্লভ গুণের অধিকারিণী এই মহীয়সী নারী মহাভারতকারের কি বিপুল শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন তাহা উক্ত মহাকাব্যের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। নাট্যকবিতার অনতিবিস্তৃত বর্ণনার মধ্যে গান্ধারীর সেই বিরাট, জটিল রূপের সমগ্র পরিচয় পরিস্ফুট করিয়া তোলা সম্ভব নহে। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চরিত্রের কেন্দ্রীয় প্রধান প্রবৃত্তিটি—ধর্ম্মে অবিচল নিষ্ঠার ভাবটি—অকম্পিত হস্তে স্বল্প সংখ্যক বলিষ্ঠ রেখায় বিকশিত করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

গান্ধারী সত্যবতী, জ্ঞানবতা ও নিয়ত ধর্ম্মশীলা। ধর্ম্মাচরণ ও সত্যপালনই তাঁহার জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য ছিল। পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়ার সূচনায় তিনি কুলপাংশুল দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে ধৃতরাষ্ট্রকে কিভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। অষ্টাদশ দিনব্যাপী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রতিদিনই যখন দুর্য্যোধন যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে মায়ের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেন, তখন তিনি স্নেহবশতও 'তোমার জয় হউক' বলিতে পারিতেন না; বলিতেন 'ধর্ম্মের জয় হউক'।[১] ইহা তাঁহার তীব্র ধর্ম্মনিষ্ঠারই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই সুগভীর ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সত্যপ্রীতির সঙ্গে তাঁহার চরিত্রে যুক্ত হইয়াছিল প্রখর বাস্তববোধ, দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা এবং মর্ত্ত্য-মানবীসুলভ স্বজনপ্রীতি ও সন্তানবাৎসল্য। যুদ্ধাভিযান হইতে দুর্য্যোধনকে ক্ষান্ত করিবার জন্য তিনি বলিয়াছিলেন,—

> হে বৎস! তুমি কামক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর পাণ্ডবগণের যে অপকার করিয়াছ, এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি দৃঢ়ক্রোধ কর্ণ ও দুঃশাসনের সাহায্যে পাণ্ডবগণের অর্থ গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিতেছ, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া তোমাদের সাধ্য নহে। আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, ভীমসেন, ধনঞ্জয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হইলে, নিশ্চয়ই সমুদয় প্রজা বিনষ্ট হইবে। অতএব তুমি অমর্ষপরায়ণ হইয়া কৌরবগণকে কালগ্রাসে পতিত করিও না। তোমার দোষে যেন সমুদয় পৃথিবী বিনষ্ট না হয়। তুমি মূঢ়তাপ্রযুক্ত মনে মনে স্থির করিয়াছ যে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি বীরগণ তোমার নিমিত্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিবে;

১। দ্রষ্টব্য স্ত্রীপর্ব্ব জলপ্রাদানিক পর্ব্বাধ্যায় (রাজশেখর বসুর অনুবাদ)

> কিন্তু তাহা কখনই হইবার নহে; কেন না, এই রাজ্যে তোমাদের ও পাণ্ডবগণের সমান অধিকার আছে এবং উক্ত মহাত্মারা তোমাদের উভয় পক্ষের প্রতিই সমান প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু পাণ্ডবগণ তোমাদের অপেক্ষা সমধিক ধর্ম্মশীল। ঐ মহাত্মাগণ রাজার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছেন বলিয়া সমরে স্বীয় জীবন পরিত্যাগ করিবেন, তথাপি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কখনই প্রহার করিতে সম্মত হইবেন না। হে পুত্র! মনুষ্যগণ লোভ পরতন্ত্র হইয়া কদাপি অর্থ লাভ করিতে পারে না। অতএব তুমি লোভ পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত হও।[১]

এই উপদেশের মধ্যে একাধারে তাঁহার অপরিসীম ধর্ম্মজ্ঞান, বাস্তববোধ, বিচক্ষণতা ও পরিণামদর্শিতার প্রমাণ দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে। মহাভারতের স্ত্রীপর্ব্বের প্রায় সমস্তটাই তাঁহার মধুর মমত্ববোধ, উদার আত্মীয়-প্রীতি ও অপরিসীম কারুণ্যের স্বাক্ষরে সমুজ্জ্বল হইয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর মধ্যে এমন সমগ্রতার আবেদন নাই। 'অনন্তবোধের আলোকে সমস্তকে দেখা এবং অনন্তবোধের প্রেরণায় সমস্ত কাজ করা'— মনুষ্যত্বের এই সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য, এই সত্যধর্ম্মানুসরণের আদর্শেই রবীন্দ্রনাথ গান্ধারীর জীবনের পথ ও মত নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। পার্থিব সকল দুঃখ, দৈন্য, শূন্যতার উর্দ্ধে স্থিত হইয়া প্রশান্ত চিত্তে ন্যায় ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন তিনি। তাঁহার কাছে "ধর্ম নহে, সম্পদের হেতু, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু, ধর্মেই ধর্মের শেষ!" ধর্ম্ম সম্বন্ধে এমন সর্ব্বসংস্কারমুক্তির প্রত্যয়ে পৌঁছাইতে হইলে মানব চিত্তবৃত্তির সাধারণ ব্যবহারিক প্রকাশকে দমন করিতে হয়। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা চলিতে পারে। তিনি বলিয়াছেন,—

> যে মানুষ সত্যের জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছে, দেশের জন্যে, লোকহিতের জন্যে—বৃহৎ ভূমিকায় যে নিজেকে দেখছে, ব্যক্তিগত সুখদুঃখের অর্থ তার কাছে উলটো হয়ে গেছে। সে মানুষ সহজেই

১। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারত: উদ্যোগ পর্ব্ব, অষ্টাবিংশত্যধিক-শততম অধ্যায়

সুখকে ত্যাগ করতে পারে এবং দুঃখকে স্বীকার ক'রে দুঃখকে অতিক্রম করে। স্বার্থের জীবনযাত্রায় সুখদুঃখের ভার গুরুতর, মানুষ স্বার্থকে যখন ছাড়িয়ে যায় তখন তার ভার এত হাল্কা হয়ে যায় যে, তখন পরম দুঃখের মধ্যে তার সহিষ্ণুতাকে, পরম অপমানের আঘাতে তার ক্ষমাকে, অলৌকিক বলে মনে হয়। আপনাকে বৃহতে উপলব্ধি করাই সত্য, অহংসীমায় অবরুদ্ধ জানাই অসত্য। ব্যক্তিগত দুঃখ এই অসত্যে। [১]

রবীন্দ্রনাথের গান্ধারী চরিত্রে এমনই এক নির্দ্বন্দ্ব, নিরুদ্বেল অবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায়। ন্যায়ধর্ম্মের পরিচর্য্যা করিতে যাইয়া মাতৃহৃদয়ের স্বরসবাহী স্নেহ-মন্দাকিনীধারাকে পর্য্যন্ত তিনি বিশুষ্ক করিয়া তুলিয়াছেন। তাই ন্যায়বিরুদ্ধ পথের অনুসরণকারী দুর্য্যোধনের সম্বন্ধে উচ্চারিত তাঁহার অভিযোগে মাতৃ-হৃদয়ের কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-কুণ্ঠা অথবা কোনরূপ চিত্তদৌর্ব্বল্য ছায়াপাত করিতে পারে নাই। পুত্র-স্নেহাতুর ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরে ন্যায়ধর্ম্ম পালনের সুদৃঢ় সঙ্কল্প জাগাইয়া তুলিবার সর্ব্বশেষ চেষ্টায় নিজেকেই অনুকরণযোগ্যরূপে উপস্থাপিত করিয়া অকম্পিত কণ্ঠেই তিনি বলিতে পারিয়াছেন,—

মাতা আমি নহি ? গর্ভভারজর্জরিতা
জাগ্রত হৃৎপিণ্ডতলে বহি নাই তারে ?
স্নেহবিগলিত চিত্ত শুভ্র দুগ্ধধারে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে নাই দুই স্তন বাহি
তার সেই অকলঙ্ক শিশুমুখ চাহি ?
শাখাবন্ধে ফল যথা সেইমতো করি
বহু বর্ষ ছিল না সে আমারে আঁকড়ি
দুই ক্ষুদ্র বাহুবৃন্ত দিয়ে—লয়ে টানি
মোর হাসি হতে হাসি, বাণী হতে বাণী,
প্রাণ হতে প্রাণ ? তবু কহি, মহারাজ,
সেই পুত্র দুর্যোধনে ত্যাগ করো আজ।

১ মানুষের ধর্ম : রবীন্দ্র রচনাবলী, ২০ শ খণ্ড

নিত্যধর্ম্মকে অবিরোধে অনুসরণ করিতে গিয়া তাঁহাকে মানব চিত্তবৃত্তির সহিত কি কঠিন বোঝাপড়া করিতে হইয়াছিল ঐ উক্তির সাহায্যে সহজেই তাহা অনুমান করা চলে। ঐ প্রচেষ্টাতেই পুত্রবৎসলতাও তাঁহার জীবনে জন্মান্তরীণ স্মৃতির সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। 'দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার'—প্রবচন-সদৃশ জীবন-সত্যের এমন অপূর্ব্ব একটি বাক্য তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইলেও

—Myself will to my darling be
Both law and impulse.—[১]

অন্তরের নিগূঢ় উপলব্ধিরূপে তাঁহার জীবনে ইহার প্রকাশ স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। এখানেই রবীন্দ্রনাথের গান্ধারী চরিত্রের দুর্ব্বলতা। নিত্যধর্ম্মের প্রতি একাগ্র নিষ্ঠাবশেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, একের অন্যায় বহুর সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠে। তাই অপরাধী দুর্য্যোধনকে ত্যাগ করিয়া বৃহত্তর সর্ব্বনাশের হাত হইতে কৌরব বংশকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি এমন সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছেন। সেই কারণে শুধু ধৃতরাষ্ট্রকেই পাপমতি দুর্য্যোধনকে নির্ব্বাসনের আদেশ দান করিতে অনুরোধ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, বিজয়-গৌরবোদ্দীপ্তা দুর্য্যোধন-পত্নী ভানুমতীকেও আনন্দোৎসবের পরিবর্ত্তে স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে উপদেশ দিয়াছেন,—

বৎসে, ভাঙিয়ো না বদ্ধ সেতু।
ক্রীড়াচ্ছলে তুলিয়ো না বিপ্লবের কেতু
গৃহ-মাঝে—আনন্দের দিন নহে আজি।
স্বজন দুর্ভাগ্য লয়ে সর্ব অঙ্গে সাজি
গর্ব করিয়ো না মাতঃ। হয়ে সুসংযত
আজ হতে শুদ্ধচিত্তে উপবাসব্রত
করো আচরণ—বেণী করি উন্মোচন
শান্ত মনে করো বৎসে, দেবতা-অর্চন।

নিত্য ধর্ম্মের আরতি দীপশিখাকেই তাঁহার জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে চাওয়ায় কবি গান্ধারীর স্নিগ্ধ, কোমল, মানবীয় মাধুর্য্যের দিকটি এই নাট্যকবিতায় তেমনভাবে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার সুযোগ পান নাই। একবার মাত্র

1. Wordsworth : The Education of Nature.

বনগমনোদ্যত যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর সহিত ব্যবহারের ভিতর দিয়া তিনি কথঞ্চিৎ পরিমাণে সে-অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তথাপি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অবসানে পুত্রশোকাতুরা যে-গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত অভিশাপ বর্ষণ করিতে দ্বিধা করেন নাই ;[১] পদধূলি গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে যুধিষ্ঠির পদপ্রান্তে নত হইলে আবরণ বস্ত্রের ফাঁক দিয়া যে-গান্ধারীর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি যুধিষ্ঠিরের নখাগ্রে পতিত হইয়া উহা দগ্ধ করিয়া দেয়,[২] কুন্তীর পুত্র (যুধিষ্ঠির) জন্মিয়াছে জানিয়া যিনি ঈর্ষ্যাবশে ব্যাসের নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিয়াও অসময়ে নিজের গর্ভপাত করিয়াছিলেন,[৩] রবীন্দ্রনাথের গান্ধারী চরিত্রে সেই ভালমন্দ-মিশানো সহজ-সুন্দর মানবিক আবেদন নাই। মূল মহাভারত পাঠে জানা যায় যে, "ধর্ম্মচারিণী, রূপযৌবনশালিনী, পাণ্ডবপ্রণয়িণী পাঞ্চাল রাজনন্দিনীকে সভায় সমাগত দেখিয়া গান্ধারী প্রভৃতি ভরতবংশীয় মহিলাগণ ও সমুদয় প্রজাগণ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছিলেন।"[৪] ঐ সামান্য ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ গান্ধারীর মুখে এই সম্পর্কে যে দীর্ঘ ভাষণ আরোপ করিয়াছেন তাহাতে গান্ধারীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অঙ্কন অপেক্ষা কবির আত্মভাব প্রকাশের ব্যাকুলতাই অধিকতর প্রবলভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই উক্তিটি অত্যন্ত দীর্ঘ বিধায় আমরা উহার শেষাংশটুকু মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি। দ্যূতসভায় পুত্রগণকর্ত্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণের উল্লেখ করিয়া গান্ধারী বলিতেছেন,—

কিন্তু প্রভু, মাতৃগর্বভরে
ভেবেছিনু, গর্ভে মোর বীরপুত্রগণ
জন্মিয়াছে—হায় নাথ, সেদিন যখন
অনাথিনী পাঞ্চালীর আর্তকণ্ঠরব
প্রাসাদপাষাণভিত্তি করি দিল দ্রব
লজ্জা-ঘৃণা-করুণার তাপে, ছুটি গিয়া
হেরিনু গবাক্ষে, তার বস্ত্র আকর্ষিয়া
খল খল হাসিতেছে সভা-মাঝখানে
গান্ধারীর পুত্রপিশাচেরা—ধর্ম জানে,

১। দ্রষ্টব্য, স্ত্রীপর্ব্ব : স্ত্রীবিলাপপর্ব্বাধ্যায়
২। দ্রষ্টব্য, ঐ : জলপ্রাদানিকপর্ব্বাধ্যায়
৩। দ্রষ্টব্য, আদিপর্ব্ব : আদিবংশাবতরণপর্ব্বাধ্যায়
৪। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারত : সভাপর্ব্ব, অনুদ্যূত পর্ব্বাধ্যায়

সেদিন চূর্ণিয়া গেল জন্মের মতন
জননীর শেষ গর্ব।

মহারাজ, শুন মহারাজ,
এ মিনতি। দূর করো জননীর লাজ,
বীরধর্ম করহ উদ্ধার, পদাহত
সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন, অবনত
ন্যায়ধর্মে করহ সম্মান—ত্যাগ করো
দুর্যোধনে।

গান্ধারীর এই বিক্ষোভ-জ্বালা ও লজ্জামিশ্রিত প্রার্থনার শেষে সেই বিখ্যাত কাল-আবাহন-মন্ত্রটি গান্ধারী চরিত্রের সঙ্গে যথেষ্ট সঙ্গতি রাখিয়া আবির্ভূত হয় নাই। দুর্যোধন তাঁহার মত জননী পাইয়াও অধর্মকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। ইহার পরও ধর্ম্ম সম্পর্কে এতখানি উচ্চকণ্ঠ হওয়া মানব-চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক কিনা তাহা সংশয়স্থল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শের পক্ষে উহা যে যথেষ্ট উপযোগী হইয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তিনি যদিও বলিয়াছেন,—

> লোকজীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা করে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ মঙ্গল এবং উপনিষদিক মোহ বিস্তার করে তার বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছি এমন অপবাদ কেউ কেউ আমাকে দিয়েছেন। আমার কাব্য সমগ্রভাবে আলোচনা করে দেখলে হয়তো তাঁরা দেখবেন আমার প্রতি অবিচার করেছেন। আমার বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত আমি এই বাণীর পন্থাতেই আমার পদ্য ও গদ্য রচনাকে চালনা করেছি—
>
> জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
> তুমি বিচিত্ররূপিণী! [১]

তথাপি আমরা দেখি যে প্রাকৃত জগতের মধ্যে বিচিত্ররূপিণীকে তাহার ব্যবহারিক সত্তায় বিচিত্ররূপে দেখা কবির পক্ষে সকল সময়ে সম্ভব হয় নাই।

১। চিত্রার সূচনা : রবীন্দ্ররচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথের মত এমন একান্ত আত্মভাব নিমগ্ন কবির পক্ষে নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টির বিপদ এখানেই। স্রষ্টার মানস আদর্শের ছাঁচে পড়িয়া অনেক ক্ষেত্রেই লোকজীবনের স্বাভাবিক প্রকাশ উপেক্ষিত হইয়া ভিন্ন ধারায় চরিত্রের পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ গান্ধারী সম্বন্ধে অন্য একটি মস্ত বড় পরিবর্ত্তন সাধন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। উপরের উদ্ধৃতিটি সে-প্রমাণও বহন করিতেছে। মহাভারতে দেখি স্বামীর দৃষ্টিহীনতার দুঃখ ভাগ করিয়া লইবার জন্য গান্ধারী স্বেচ্ছায় বস্ত্রাবরণের দ্বারা নিজের চক্ষু আবৃত করিয়া রাখিতেন।[১] এই কারণে তাঁহার পক্ষে কোন কিছু দেখাই ছিল অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর দৃষ্টি বন্ধনমুক্ত। 'ছুটি গিয়া হেরিনু গবাক্ষে' ইত্যাদি কথায় এবং ভানুমতীর 'ভয়ংকরী কান্তি, প্রলয়ের সাজ' দর্শনে ইহারই প্রমাণ মিলে। কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গণে গান্ধারী মৃত পুত্রদের শব দেখিতে পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহা সম্ভব হইয়াছিল তাঁহার দিব্যদৃষ্টি লাভের জন্য।[২]

মহাভারতে মধ্যে মধ্যে দুর্য্যোধনের পত্নীগণের উল্লেখ দেখা যায়, এককভাবে ভানুমতীর বিশেষ কোন পরিচয় সেখানে নাই। রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন কল্পনাবলে দুর্য্যোধনের যোগ্য পত্নীরূপে ভানুমতীর চরিত্রটি স্বল্পাক্ষরে হইলেও অতিশয় নিপুণতার সঙ্গেই অঙ্কিত করিয়াছেন। স্বামীর মতই ক্ষত্রিয়সুলভ শঙ্কাশূন্যতা, সম্পদে বিপদে সমান উপেক্ষা এবং সর্ব্বোপরি ঈর্ষ্যা তাঁহারও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কবির পরিকল্পনা এখানেই নিঃশেষিত হয় নাই। এই বীরত্বব্যঞ্জক, পুরুষসুলভ গুণগুলির সহিত অলঙ্কারপ্রিয়তা যোগ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ভানুমতীর নারী-সত্তাও এক মুহূর্ত্তের জন্য পাঠককে ভুলিতে দেন নাই। নিম্নের পংক্তি কয়টির মধ্যে তাঁহার নারী-স্বরূপের পরিচয় অতি সুন্দর-ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে।—

জিনি বসুমতী
ভুজবলে, পাঞ্চালীরে তার পঞ্চপতি
দিয়েছিল যত রত্ন মণি অলঙ্কার—
যজ্ঞদিনে যাহা পরি ভাগ্য অহংকার

১। দ্রষ্টব্য, আদিপর্ব্ব : আদিবংশাবতরণ পর্ব্বাধ্যায়
২। দ্রষ্টব্য, স্ত্রীপর্ব্ব : স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বাধ্যায়

ঠিকরিত মাণিক্যের শত সূচীমুখে
দ্রৌপদীর অঙ্গ হতে, বিদ্ধ হত বুকে
কুরুকুলকামিনীর, সে রত্নভূষণে
আমারে সাজায়ে তারে যেতে হল বনে।

এই পংক্তিগুলির ইঙ্গিত অবশ্য রবীন্দ্রনাথ মূল মহাভারতেই পাইয়াছেন। সেখানে উল্লিখিত আছে যে, প্রথমবার দ্যূতক্রীড়ার জন্য যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী, অনুজগণ ও পরিজনবৃন্দসহ হস্তিনাপুরের রাজগৃহে প্রবেশ করিলে দ্রৌপদীর অত্যুজ্জ্বল বেশভূষা দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূরা মর্ম্মাহত হন।[১] রবীন্দ্রনাথ অন্যতর উপায়েও ভানুমতী চরিত্রটি আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বলিষ্ঠতাই তাঁহার চরিত্রের একমাত্র উপাদান নহে, শ্রদ্ধা, ভক্তি, কমনীয়তাও তাঁহার চরিত্রটিকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। নিম্নলিখিত উক্তিটির মধ্য দিয়া তাঁহার চরিত্রের সেই মাধুর্য্যের দিকটি সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।—

দুর্দিন দুর্যোগ যদি আসে,
বিমুখ ভাগ্যেরে তবে হানি উপহাসে
কেমনে মরিতে হয় জানি তাহা দেবী,
কেমনে বাঁচিতে হয় শ্রীচরণ সেবি
সে শিক্ষাও লভিয়াছি।

তাঁহার মুখে এই কথাটি উচ্চারণ করাইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে সমস্ত অভিযোগের অবসান ঘটাইয়াছেন। প্রসঙ্গত এখানে বলা দরকার যে, বাংলা সাহিত্যে ভানুমতীর চরিত্র-কল্পনা সর্ব্ব প্রথম মাইকেল মধুসূদনই করেন তাঁহার বীরাঙ্গনা কাব্যের ভানুমতী পত্রিকায়। তবে রবীন্দ্রনাথের সহিত উহার সাদৃশ্য খুব অল্পই চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের ভানুমতী চরিত্রের সহিত বরং মাইকেলের প্রমীলা চরিত্রের সাদৃশ্যই অধিক।

১। দ্রষ্টব্য, রাজশেখর বসু : মহাভারত, ১২৭ পৃঃ

॥ নরক বাস ॥

'নরকবাসের' অন্য নাম হইতে পারিত সোমক-ঋত্বিক সংবাদ। মর্ত্ত্য-জীবন লীলার শেষে রাজা সোমক চলিয়াছেন স্বর্গে। স্বর্গের পথি-পার্শ্বে নরকের অবস্থান। সহসা নেপথ্য-আহ্বান শুনিয়া সোমক নরকে প্রবেশ করেন এবং রাজপুরোহিতকে নরকবাসীদের মধ্যে দেখিতে পাইয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হন। রাজার বিস্ময়সূচক ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে এবং প্রেতগণের অনুরোধে ঋত্বিক তাঁহার নরকবাসের হেতু বর্ণনা প্রসঙ্গে মর্ত্ত্যজীবনে তাঁহারই নির্দ্দেশে অনুষ্ঠিত সোমকের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের এক রোমহর্ষক বিবরণ দান করিলেন। রাজ-পুরোহিতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া সোমক তাঁহার নরকবাসের সঙ্গী হইলেন। আলোচ্য নাট্যকবিতাটির কাহিনী অংশ ইহাই। এই কাহিনী মহাভারতের বনপর্ব্বের তীর্থযাত্রাপর্ব্বাধ্যায়ের অন্তর্গত।

ঋত্বিকের নরক বাসের বিষয়টি মূল মহাভারতে অমীমাংসিত এক সমস্যারূপে বিরাজ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথকেও হয় ত ইহা বিচলিত করিয়াছিল। তাই কবি-কল্পনার প্রোজ্জ্বল রশ্মিপাতে সেই প্রাচীন বস্তুতে এক নূতন তাৎপর্য্য দান করিয়া তিনি উহাকে সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যকারণসূত্রে বাঁধিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। বিরাট আদর্শবাদের মন্ত্রে এই শোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তিনি সোমকের মধ্যে রাজধর্ম্ম ও হৃদয়ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব এবং ঋত্বিকের মধ্যে প্রচণ্ড আত্মাভিমানের সমাবেশ ঘটাইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এই পরিবর্ত্তন সাধন করিতে গিয়া কবিকে মূল কথাবস্তু এবং উহার লক্ষ্যকে অনেকখানি পরিমাণেই বদলাইয়া লইতে হইয়াছে।

নরক বর্ণনায় ও প্রেতগণের চরিত্র পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাহা ছাড়া, প্রধান চরিত্র দুইটির পরিকল্পনায়ও তাঁহাকে কতক পরিমাণে বাস্তব সত্যকে লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে। মূলে সোমক চরিত্র নির্দ্বন্দ্ব ছিল। শত পুত্র লাভের আশায় রাজপুরোহিত ও মন্ত্রিবর্গের পরামর্শক্রমে এবং নিজের বিবেক-বুদ্ধির সমর্থন অনুযায়ীই তিনি পুত্রার্থ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সেখানে রাজপুরোহিতও নিরপরাধ। এক মাত্র পুত্রের জন্য রাজার সর্ব্বদাই যে দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, উৎকণ্ঠা তাহা নিবারণের জন্য এবং শত মহিষীর আপন আপন পুত্র কামনাকে সার্থক করিবার জন্যই ঋত্বিক পুত্র-মেধের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সোমকের শত পুত্র লাভের ইচ্ছা এবং ঋত্বিকের দায়িত্ব পালনের কাহিনী মহাভারতে যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহার প্রয়োজনীয় অংশটুকু উদ্ধৃত করা গেল।—

কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ সোমক ঋত্বিক ও অমাত্যগণসহ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া সভামণ্ডপে উপবেশনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হায়! এক পুত্র কি কষ্টদায়ক! উহা অপেক্ষা অপুত্রক হওয়া উত্তম। একপুত্রতা চিররোগিতা অপেক্ষাও ক্লেশকর। আমি পুত্র লাভেচ্ছায় এই এক শত পত্নীর, পরীক্ষা করিয়া পাণিগ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু কাহারও গর্ভে অপত্য উৎপন্ন হইল না; কেবল এই একমাত্র জন্তু বহু প্রযত্নে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। হায়! ইহার পর দুঃখের বিষয় আর কি আছে? আমার ও পত্নী সমুদয়ের বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হইয়াছে, পুত্রলাভের আর সম্ভাবনা নাই। ঐ এক পুত্রে আমাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পিত হইয়াছে; অতএব হে দ্বিজোত্তম! যদি এমত কোন কর্ম্ম থাকে, যাহাতে শত পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা আদেশ করুন; ঐ কার্য্য লঘু বা মহৎ, সুকর বা দুষ্কর হউক, অবশ্যই সম্পন্ন করিব।"

অনন্তর ঋত্বিক কহিলেন, "হে রাজন্! আমি আমার ভবনে এক যজ্ঞ করিব, সেই যজ্ঞে আপনাকে স্বীয় আত্মজ জন্তুর বসার দ্বারা আহুতি প্রদান করিতে হইবে। সেই সময় আপনার পত্নীগণ আহুতিসমুত্থিত ধূম আঘ্রাণ করিলে তাঁহারা সকলেই এক এক মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিবেন। আর ঐ জন্তুও আপনার যে পত্নীর গর্ভে জন্মিয়াছে, পুনরায় তাঁহারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে, উহার বামপার্শ্বে এক অপূর্ব্ব সৌবর্ণ-চিহ্ন থাকিবে। [১]

যথাকালে সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং যজ্ঞের ফল ঋত্বিকের কথা অনুযায়ীই ফলিয়াছিল। যজ্ঞের আহুতিসমুত্থিত ধূম আঘ্রাণ করিয়া সকল পত্নীই গর্ভ-ধারণ করেন এবং যথা সময়ে শত পুত্রের জন্ম দান করেন। জন্তু পূর্ব্ব-জন্মের জননীর গর্ভেই জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে জন্ম লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথ অতি চমৎকারভাবে সোমকের স্নেহবিমূঢ় অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু রাজা বা রাজমহিষীদের পুত্রকামনা এবং সেই কামনা পূরণের ইতিহাসের কোন ইঙ্গিত তাঁহার কাহিনীতে দেন নাই। তিনি ঋত্বিককেই সমস্ত ঘটনার একক নিয়ন্ত্রণকারীরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। পুত্রস্নেহের আতিশয্যের

১। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারত: বনপর্ব্ব, সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

এক বিমূঢ় অবস্থায় রাজা পুরোহিতের যে অভিমান-বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তোলেন সেই বহ্নি-শিখাই যজ্ঞানল শিখারূপে রাজার প্রাণপ্রিয় পুত্রকে অনল-কুণ্ডে ফেলিয়া গ্রাস করে। এই ঘটনার যে রোমহর্ষক ও মর্ম্মবিদারী বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে যে, রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব-কল্পনা স্বধর্ম্মচ্যুতই কেবল হয় নাই বাস্তব সত্যেরও বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে। ঋত্বিকের যে ভয়ালভীষণ মূর্ত্তিটির সাক্ষাৎ পাই রবীন্দ্র-সাহিত্যে তাহা একক। শত রাজমহিষীর বক্ষচ্যুত করিয়া—'এত বলি বল করি মাতৃগণ-অঙ্ক হতে লইলাম হরি সহাস্য শিশুরে'—কোন রাজপুরোহিতের পক্ষেই এমন কার্য্য বাস্তব সত্যসম্মত হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে টমসন সাহেবের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন,—

> Nor is the tale convincing. No man could have torn the child from the grasp of many who are represented as bent on holding him—everyone, priest and layman, man and woman, aghast at the projected murder. [১]

কর্ত্তব্যচ্যুত নরপতিকে রাজধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করা নিঃসন্দেহে রাজপুরোহিতের কর্ত্তব্য কিন্তু এখানে সে দায়িত্ব পালনের অজুহাতে ঋত্বিকের আহত অহমিকাই এক বিকৃত বীভৎস পন্থা অনুসরণ করিয়াছে। ঋত্বিকের মুখেই শুনিতে পাই,—

> সে মুহূর্তে প্রবেশিনু রাজসভা-মাঝে
> আশিস করিতে নৃপে ধান্যদূর্বাকরে
> আমি রাজপুরোহিত। ব্যগ্রতার ভরে
> আমারে ঠেলিয়া রাজা গেলেন চলিয়া,
> অর্ঘ্য পড়ি গেল ভূমে। উঠিল জ্বলিয়া
> ব্রাহ্মণের অভিমান।

ইহার পরও তাঁহাকে বলিতে শুনা যায়,—

> আমি শুধু কহিলাম বিদ্বেষের তাপ
> অন্তরে পোষণ করি, 'এক-পুত্র-শাপ
> দূর করিবারে চাও, পন্থা আছে তারো—

১। E. Thompson : Rabindra Nath Tagore, page 167

ক্ষাত্রধর্ম্মানুরাগী সোমক রাজপুরোহিতের নির্দ্দেশিত পন্থাই নির্ব্বিরোধে পালন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা করিয়া তিনি সুখী হইতে পারেন নাই। ঋত্বিকের প্ররোচনায় হৃদয়ানুশাসনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সারা জীবন তিনি উহার বিষময় ফল ভোগ করিয়াছেন, সারা ক্ষণ অনুতাপ-জ্বালায় দগ্ধ হইয়াছেন। সে যাতনা তাঁহার জীবনে এত তীব্র ও গভীর হইয়াছিল যে, মর্ত্ত্য-জীবনের সমস্ত হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত করিবার পরও তিনি উহার হাত হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পান নাই। নরকের প্রেত-সমাজে উপস্থিত নৃপতি অতীত স্মৃতি-চারণা করিয়া কাতর কণ্ঠে বলিয়াছেন,—

বীর্য আপনার
নিন্দুক সমাজ-মাঝে করিতে প্রচার
নরধর্ম রাজধর্ম পিতৃধর্ম হায়
অনলে করেছি ভস্ম। সে পাপজ্বালায়
জ্বলিয়াছি আমরণ—এখনো সে তাপ
অন্তরে দিতেছে দাগি নিত্য অভিশাপ।

অগ্নিদগ্ধ হইয়া যেমন স্বর্ণের শ্যামিকা দূর হয় তেমনি করিয়া মানবধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ জনিত রাজার চরিত্রের কালিমা শোকানলে দগ্ধ হইয়া তাঁহাকে স্বর্গবাসের মহান অধিকার দান করিয়াছিল। বাহিরের আনুষ্ঠানিক প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা প্রটেষ্ট্যাণ্ট বা ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুমোদিত হৃদয় সন্তাপের দ্বারা পাপ মোচনের এইরূপ ব্যবস্থার উপরেই রবীন্দ্রনাথের অধিকতর আস্থা ছিল। তাঁহার মতে—'পাপ করে সন্তপ্ত হলে সেই সন্তাপ থেকেই পাপের মোচন হয়।'[১] দুর্গত, হতভাগ্য ঋত্বিকের সঙ্গ কামনায় সেই স্বর্গবাসের অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া রাজা 'নিত্যকাল উদ্ভাসিত অনির্বাণ জ্যোতি'র মহিমা প্রাপ্ত হন। এই সমস্ত কৌশল অবলম্বনের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ সোমককে মহাভারতের বর্ণনা অপেক্ষা অধিক জীবন্ত ও উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন।

কিন্তু ঋত্বিকের কোন হৃদয় দহন ছিল না। সেই কারণে নরকভোগই হইয়াছে তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের একমাত্র উপায়। মানব কর্ম্মফলের সর্ব্বশেষ

১। মানুষের ধর্ম: রবীন্দ্ররচনাবলী ২০শ খণ্ড, ৪১০ পৃষ্ঠা

বিচারক ধর্ম্মরাজের বিধানেই উভয়ের জন্য এই স্বতন্ত্র লোক-ভোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঋত্বিকসহ রাজার নরকবাস বাসনা জ্ঞাপিত হইলে ধর্ম্মরাজ বলিয়াছেন,—

করিয়াছ প্রায়শ্চিত্ত তার
অন্তর-নরকানলে। সে পাপের ভার
ভস্ম হয়ে ক্ষয় হয়ে গেছে। যে ব্রাহ্মণ
বিনা চিত্ত-পরিতাপে পরপুত্রধন
স্নেহবন্ধ হতে ছিঁড়ি করেছে বিনাশ
শাস্ত্রজ্ঞান-অভিমানে, তারি হেথা বাস
সমুচিত।

এবম্বিধ নানা উপায়ে রবীন্দ্রনাথ সোমকের সহিত ঋত্বিকের বৈপরীত্য পরিস্ফুটনের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা দ্বারা অন্তরৈশ্বর্য্যে উভয়ে যে সমান ধনী নহেন উহা প্রমাণ করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছে। পূর্ব্বে ঐরূপ পার্থক্য সূচক দৃষ্টান্ত কিছু কিছু উল্লেখ করা গিয়াছে। এক্ষণে আর একটির কথাও বলিব। মর্ত্ত্য-সহচরের সঙ্গ কামনায় সোমক স্বেচ্ছায় স্বর্গবাসের অধিকার ত্যাগ করেন। ঋত্বিকও রাজার সহবাস প্রার্থনা করেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য ভিন্ন। প্রবল ঈর্ষ্যার বশে রাজার স্বর্গগমনে বাধা দিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

যেয়ো না, যেয়ো না তুমি চলে,
মহারাজ! সর্পশীর্ষ তীব্র ঈর্ষানলে
আমারে ফেলিয়া রাখি যেয়ো না, যেয়ো না
একাকী অমরলোকে! নূতন বেদনা
বাড়ায়ো না বেদনায় তীব্র দুর্বিষহ,
সৃজিয়ো না দ্বিতীয় নরক। রহো রহো,
মহারাজ, রহো হেথা।

এই উক্তিতে 'দ্বিতীয় নরকের' ব্যঙ্গ্যার্থ তীব্র ঈর্ষ্যানলের নরক।

কাহিনীর এই অংশেও রবীন্দ্রনাথ মূলের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। মূল মহাভারতে আছে,—

> মহাত্মা সোমক মহীপতি ঋত্বিকের বচন শ্রবণান্তর যমকে কহিলেন, 'হে ধর্ম্মরাজ! আমার যাজককে এই নরক হই.ত বিমুক্ত করুন; আমি স্বয়ং এই নরকাগ্নি মধ্যে প্রবেশ করিব, ইনি আমার গুরু, আমারই নিমিত্ত এই নরকানলে দগ্ধ হইতেছেন।' যম কহিলেন, 'হে রাজন্! একজনের কর্ম্মফল অন্যে ভোগ করিতে পারে না। ঐ দেখ তোমার সমুদয় সৎকর্ম্মের ফল বিদ্যমান রহিয়াছে।' সোমক কহিলেন, 'এ ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি ব্যতিরেকে আমি পবিত্র লোক ভোগ করিতে বাসনা করি না, স্বর্গেই হউক আর নরকেই হউক, আমি ইঁহার সহিত একত্র বাস করিতে বাসনা করি। ইঁহার ও আমার কর্ম্মফল সমান, অতএব আমাদের দুইজনের পুণ্যাপুণ্যফল সমান হউক।' যম কহিলেন, 'যদি তোমার এইরূপ অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে উহার সহিত সমকাল নরক-ভোগ কর। পরিশেষে তোমরা উভয়েই সদ্গতি লাভ করিবে।[১]

॥ কর্ণ-কুন্তী সংবাদ ॥

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বদিন গঙ্গাতীরে কর্ণ সন্ধ্যাসবিতার বন্দনায় রত; সেই অবস্থায় কুন্তী তাঁহার কাছে আসিয়াছেন মাতৃত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাকে পাণ্ডব শিবিরে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে। কিন্তু সকল অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও কর্ণ তাঁহার প্রতিপালক মাতাপিতার সহিত সম্বন্ধসূত্র ছিন্ন করিতে এবং তাঁহার বর্ত্তমান উন্নতি অর্জ্জনের সহায়ক কৌরব পক্ষ ত্যাগ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। ইহাই কর্ণ-কুন্তীসংবাদের আসল ঘটনাংশ। অবশ্য ইহার উপর প্রচুর আলোকপাত করিবার জন্য এবং কাহিনীর একটা প্লটগত ঐক্য সৃষ্টির প্রয়োজনে উভয়ের কথোপকথনের মধ্য দিয়া অতিশয় নৈপুণ্যসহকারে অতীতের কোন কোন বিষয়েরও উল্লেখ করা হইয়াছে। এই নাট্যকবিতার মূল কাহিনী-ভাগ মহাভারতের উদ্‌যোগপর্ব্বের অন্তর্গত ভগবদ্-যান পর্ব্বাধ্যায়ের দুইটি ঘটনা—কৃষ্ণ-কর্ণ কথোপকথন এবং কর্ণ-কুন্তীসমাগমের সারাংশ লইয়া রচিত।

১। কালীপ্রসন্নসিংহের অনুদিত মহাভারত: বনপর্ব্ব, অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়

প্রতিটি নাট্যকবিতার মত ইহাও সমস্যা কণ্টকিত, বরং অন্য সব কয়টির তুলনায় ইহার সমস্যা সর্ব্বাধিক জটিল ও বিভিন্নমুখী। কর্ণ ও কুন্তী উভয়ের চরিত্রের আধারেই কবি সেই সমস্যাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, কর্ণের দ্বন্দ্বময়, জটিল চরিত্র চিত্রণই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

মুখ্যত মহাভারতের ইঙ্গিত লইয়াই রবীন্দ্রনাথ দুর্য্যোধনকে বিরাট ব্যক্তিত্ব-মণ্ডিত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু কর্ণের ক্ষেত্রে আরও অধিক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই চরিত্রটিতে তিনি পূর্ব্বাপর চরিত্রগত ঐক্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। কর্ণকে তিনি ভদ্ররুচি ও শালীনতাবোধসম্পন্ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু নীচতা ও উদারতার অপূর্ব্ব সমাবেশে তাঁহার চরিত্রের বিরাটত্ব, উদাত্ততা এবং গাম্ভীর্য্য সর্ব্বত্র অটুট রাখিতে পারেন নাই। এমন কি, ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়া কর্ণের জীবনে বারংবার নিয়তির নিষ্ঠুর লীলা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের কর্ণ চরিত্র পরিকল্পনায় উহারও তেমন কোন সার্থক স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের রুচির অতি সূক্ষ্ম শালীনতা এবং তাঁহার ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও আদর্শবোধই এই পরিবর্ত্তনের মূল হেতু। তিনি কাহিনীগত পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন খুব সামান্যই। মহাভারতে কর্ণ কুন্তীর এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতের পূর্ব্বেই নিজের জন্মবৃত্তান্ত অবগত ছিলেন; যুদ্ধের অল্প কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহাকে নানাভাবে প্রলোভিত করিয়া পাণ্ডবপক্ষে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার জন্মরহস্য-যবনিকা উন্মোচন করিয়াছিলেন। কুন্তীই যে তাঁহার মাতা সে-কথা ইহারও পূর্ব্বে কর্ণ জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াও মহাভারতে উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথের কর্ণ নিজেকে মাতৃপরিত্যক্ত বলিয়া জানিতেন বটে, কিন্তু মায়ের পরিচয় কিছুই জানিতেন না। তাই তাঁহাকে বলিতে শুনি,—

> শুনিয়াছি লোকমুখে,
> জননীর পরিত্যক্ত আমি। কতবার
> হেরেছি নিশীথস্বপ্নে, জননী আমার
> এসেছেন ধীরে ধীরে দেখিতে আমায়—
> কাঁদিয়া কহেছি তাঁরে কাতর ব্যথায়
> 'জননী, গুণ্ঠন খোলো, দেখি তব মুখ'—
> অমনি মিলায় মূর্ত্তি তৃষ্ণার্ত উৎসুক
> স্বপনেরে ছিন্ন করি।

কাহিনীগত এই অতি সামান্য পরিবর্ত্তনটুকু আশ্রয় করিয়াই রবীন্দ্রনাথ কর্ণ-চরিত্রে দুই বিপরীতমুখী ভাবের সংগ্রাম সৃষ্টি করিয়াছেন,—একদিকে তীব্র মাতৃস্নেহ বুভুক্ষা, এতদিন পর জননীর সাক্ষাৎ পাইয়া সমস্ত সত্তা দিয়া তাঁহাকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিবার আকুল আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে কর্ত্তব্যবোধ ও কৃতজ্ঞতার সম্বন্ধবন্ধন। এই দ্বন্দ্বে কর্ণের জীবনে শেষ পর্য্যন্ত দ্বিতীয়টির অর্থাৎ ধর্ম্মপালন সঙ্কল্পেরই জয় হয় বটে, তবে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ঐ সংগ্রাম-দৃশ্য অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা যে স্বভাবানুগত হয় নাই নিম্নের আলোচনা হইতেই উহা বুঝা যাইবে।

প্রথমটায় কর্ণকে দেখা যায় মাতৃস্নেহ-মুগ্ধ অতিশয় ভাবপ্রবণ এক যুবকরূপে; তাঁহার ক্ষাত্র-তেজ, শৌর্য্য-বীর্য্য, ব্যক্তিত্ব, পুরুষকার সমস্তই ঐ এক মাতৃ-নামের কাছে অবনত-শীর্ষ ফণীর ন্যায় স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। যিনি একদা ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধা জননী,
রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করনি ॥[১]

সেই রবীন্দ্রনাথই কর্ণকে ক্ষত্রিয়তর না করিয়া বাঙালীসুলভ ভাবপ্রবণতার অধীন করিয়া আঁকিলেন। ইহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। কোন কবি-সত্তাই যে একেবারে সমাজ-চেতনা বা জাতীয় সংস্কারের উর্দ্ধে উঠিতে পারে না, এই ঘটনার মধ্যে উহারই সমর্থন মিলিতেছে। বাঙালী কবিদের হাতে রামায়ণ, মহাভারতের বহু চরিত্রই যে এইভাবে খাঁটি বাঙালী চরিত্রে পরিণত হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। বাঙালীর স্বভাবের অতিরিক্ত স্নেহ-বন্ধনকে যুক্তিপন্থায় নিন্দনীয় বলিয়া মনে করিলেও সৃষ্টির ভাবাবিষ্ট ক্ষণে কবি উহার স্বাভাবিকতা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই কর্ণের কণ্ঠে বাঙালীর চিরন্তন আতিশয্যময় স্নেহ-বুভুক্ষাকেই যেন কবি ভাষা দিলেন,—

শুনি স্বপ্নসম
হে দেবী, তোমার বাণী। হেরো অন্ধকার
ব্যাপিয়াছে দিগ্বিদিকে, লুপ্ত চারি ধার—

১। বঙ্গমাতা : চৈতালি

শব্দহীনা ভাগীরথী। গেছ মোরে লয়ে
কোন্ মায়াচ্ছন্ন লোকে, বিস্মৃত আলয়ে,
চেতনাপ্রত্যুষে! পুরাতন সত্য-সম
তব বাণী স্পর্শিতেছে মুগ্ধ চিত্ত মম।
অস্ফুট শৈশবকাল যেন রে আমার,
যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘেরিছে আজি। রাজমাতঃ অয়ি,
সত্য হোক স্বপ্ন হোক, এসো স্নেহময়ী
তোমার দক্ষিণ হস্ত ললাটে চিবুকে
রাখ ক্ষণকাল। * * * * *

ইহা কর্ণের মুখে উচ্চারিত হইলেও, বাঙালী পাঠকের সহিত বাঙালী কবিরই মাতৃপূজা! এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, ভৃত্যরাজতন্ত্রের অসুস্থ পরিবেশে প্রতিপালিত শিশু রবীন্দ্রনাথের মনে চিরকাল এক তীব্র মাতৃস্নেহ বুভুক্ষা ছিল।[১] আর একজন বাঙালী কবিও তাঁহার সৃষ্ট বীর চরিত্রের মাতৃস্নেহানুরক্তির মাধ্যমে আপন বুভুক্ষিত অন্তরের হাহাকারকেই এমনিভাবে নিনাদিত করিয়াছিলেন। আমরা 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং তাহার লক্ষ্মণ চরিত্রের কথা বলিতেছি। চরম সঙ্কটে জীবনের মহত্তম এক সঙ্কল্প সাধনের পূর্ব্ব লগ্নে বনবাসী লক্ষ্মণ স্বপ্নে জননীর দেখা পাইয়াছেন। দেখিয়া—

চমকি উঠিয়া বলী চাহিলা চৌদিকে!
হায় রে নয়ন-জলে ভিজিল অমনি
বক্ষঃস্থল! "হে জননি," কহিলা বিষাদে
বীরেন্দ্র, "দাসের প্রতি কেন বাম এত
তুমি? দেহ দেখা পুনঃ পূজি পা দুখানি,
পূরাই মনের সাধ লয়ে পদ-ধূলি,
মা আমার! যবে আমি বিদায় হইনু,
কত যে কাঁদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে

১। দ্রষ্টব্য, ভৃত্যরাজতন্ত্র : জীবনস্মৃতি

হৃদয় ! আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে
হেরিব চরণ-যুগ ?"[১]

ইহা যে লক্ষ্মণের জবানিতে মাদ্রাজ-প্রবাসী মধুসূদনের নিজেরই মাতৃ-প্রীতির ভাবানুষঙ্গের প্রকাশ, কবির literary self-projection, তাহা বুদ্ধিমান পাঠককে বলিয়া দিবার প্রয়োজন করে না। ঘটনা-সংস্থান ও কাল-সন্নিবেশের দিক দিয়াও আলোচ্য নাট্যকবিতার উদ্ধৃতাংশের সহিত ইহার কিছুটা সাদৃশ্য চোখে পড়ে। লক্ষ্মণ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন চরম সঙ্কটের পূর্ব্ব লগ্নে। যেদিন লঙ্কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ইন্দ্রবিজয়ী মেঘনাদের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার কথা তাহারই ঠিক পূর্ব্বরাত্রির শেষ প্রহরে লক্ষ্মণ স্বপ্নে মাতৃ-'চরণ-যুগ' দর্শন করেন। সেইদিক হইতে কর্ণ-কুন্তী সাক্ষাৎকারের কালটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কুরুক্ষেত্র মহারণের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে, ভাগীরথীর দুই পারে শিবির স্থাপন করিয়া কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় অসাধারণ যুদ্ধকুশল বীরগণ পরদিন প্রভাতে অনুষ্ঠেয় যুদ্ধের প্রতীক্ষায় অতি সন্তর্পণে কাল হরণ করিতেছেন। সেই অতিশয় সঙ্কট-জটিল-ক্ষণময় সন্ধ্যায় কর্ণের কুন্তী-দর্শন—স্বপ্নে নয়, প্রত্যক্ষ বাস্তবরূপে। কবির কর্ণ-কুন্তী সাক্ষাতের সেই বিভীষিকাময় মুহূর্ত্তটির বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

সেই স্বপ্ন আজি
এসেছে কি পাণ্ডবজননীরূপে সাজি
সন্ধ্যাকালে, রণক্ষেত্রে, ভাগীরথীতীরে !
হেরো দেবী পরপারে পাণ্ডবশিবিরে
জ্বলিয়াছে দীপালোক, এ পারে অদূরে
কৌরবের মন্দুরায় লক্ষ অশ্বখুরে
খর শব্দ উঠিছে বাজিয়া। কালিপ্রাতে
আরম্ভ হইবে মহারণ। আজ রাতে
অর্জুন জননীকণ্ঠে কেন শুনিলাম
আমার মাতার স্নেহস্বর। মোর নাম

১। মেঘনাদবধকাব্য, পঞ্চম সর্গ, ১৩৯—৪৮ পংক্তি

তাঁর মুখে কেন হেন মধুর সংগীতে
উঠিল বাজিয়া—চিত্ত মোর আচম্বিতে'
পঞ্চপাণ্ডবের পানে 'ভাই' ব'লে ধায়!

কিন্তু, এই সাদৃশ্যের মধ্যেও কবি-স্বভাবগত বৈপরীত্য ভাবনার ছাপ অল্প নহে। স্বপ্নে মায়ের দর্শন লাভ করিয়া লক্ষ্মণ উৎসাহিত ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু কর্ণের মাতৃদর্শন তাঁহার শক্তিক্ষয়েরই কারণ হইয়া উঠিয়াছে, প্রচণ্ড সমস্যার সৃষ্টি করিয়া তাঁহার সঙ্কল্পকে বিচলিত করিয়াছে। জননীর বক্ষঃক্ষীর-বঞ্চিতভাগ্য কর্ণের চতুর্দ্দিকে যে জটিলতাজাল বিস্তারিত হইয়াছিল মাতৃদর্শনের পুণ্যেও উহার হাত হইতে তিনি নিষ্কৃতির পথ দেখিলেন না।

কর্ণের পূর্ব্বোক্ত মাতৃ-সম্ভাষণে বাঙালীসুলভ আবেগবিহ্বলতার স্পর্শ থাকিলেও উহা অস্বাভাবিক নহে। কবি যে নিপুণতার সঙ্গে কর্ণের মাতৃস্নেহ-বুভুক্ষিত প্রাণের পরিচয়কে জাগাইয়া রাখিয়াছেন তাহাতে অতটুকু উচ্ছ্বাস কার্য্যকারণসূত্রে বিধৃত বলিয়াই মনে করা চলে। কিন্তু ইহার পরও যখন কর্ণকে বলিতে শুনি,—

যাব মাতঃ, চলে যাব, কিছু শুধাব না—
না করি সংশয় কিছু, না করি ভাবনা।
দেবী, তুমি মোর মাতা। তোমার আহ্বানে
অন্তরাত্মা জাগিয়াছে—নাহি বাজে কানে
যুদ্ধ ভেরী, জয়শঙ্খ,—মিথ্যা মনে হয়
রণহিংসা, বীরখ্যাতি, জয়পরাজয়।
কোথা যাব, লয়ে চলো।

—তখন স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, এমন মাতৃস্নেহপিপাসা, এমন অভিমান-প্রকাশক উক্তি, এমন মাতৃ-মমতা রসাস্বাদের প্রার্থনা কি মহাভারতের মহাবীর কর্ণের প্রার্থনা হইতে পারে? প্রতিশোধ-স্পৃহা যাহার হৃদয়কে মুহুর্মুহু স্পন্দিত করিত, প্রবল প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করিয়া আপন পুরুষ-কারের বলে যিনি চোরাবালির উপরেও প্রতিষ্ঠা-সৌধ গড়িয়া তুলিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন, সূত-জননী রাধার স্নেহেই যিনি মাতৃস্নেহ-পিপাসা মিটাইয়া-ছিলেন, যিনি ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মশাস্ত্রানুগত আচারনিষ্ঠ, যিনি স্ত্রীপুত্রের প্রতি অত্যন্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সদা স্নেহশীল তাঁহার মুখে এমন উক্তি খুব স্বাভাবিক বলিয়া

মনে হয় না। দানবীর কর্ণের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার দৃঢ়তা বুঝাইবার জন্য ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'নর-নারায়ণ' নাটক (১৩৩৩) হইতে সামান্য উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র কর্ণের কবচ-কুণ্ডল হরণ করিতে আসিবেন, স্বপ্নে দেখা দিয়া সূর্য্য কর্ণকে সেই সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নে সাবধান করিয়া দেন,—

তাই বলি, যদি প্রিয়বর
জীবিত রহিতে থাকে বাসনা তোমার—
ইচ্ছা থাকে দ্বৈরথ সমরে, প্রতিযোদ্ধা
অর্জ্জুনে করিতে পরাজয়, হে মানদ!
দৃঢ় অনুরোধ মম, যেন কোন মতে
দিয়োনা বাসবে ওই কবচ-কুণ্ডল।[১]

ইহার উত্তরে কর্ণ শুধু বলিয়াছিলেন,—

জীবিত থাকিতে চাই, অর্জ্জুন-বিজয়—
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য আমার।
তথাপি হে ভগবন্, কীর্ত্তিধ্বংসে, ব্রত-
ভঙ্গে, সত্যের আশ্রয়চ্যুত হয়ে, পল
মাত্র চাহিনা বাঁচিতে, চাহিনা অর্জ্জুনে
পরাজিতে।[২]

মহাভারতেও দেখি কৃষ্ণের মুখে নিজের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার পর কর্ণ বলিয়াছেন,—

আমি যখন এইরূপে জন্ম লাভ করিয়াছি, তখন ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পাণ্ডুই আমার পিতা, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু কুন্তী আমাকে আমার অমঙ্গল উদ্দেশ্যেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অনন্তর সারথি অধিরথ আমাকে দর্শন করিবা মাত্র গৃহে আনয়ন করিয়া সৌহার্দ্দসহকারে রাধার হস্তে সমর্পণ করিলেন। আমার প্রতি স্নেহবশতঃ তৎক্ষণাৎ রাধার স্তনে ক্ষীরসঞ্চার হইল। তিনি আমার মূত্র ও পুরীষ পরিষ্কার

১। নর-নারায়ণ, ১ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য
২। ঐ , ঐ

করিতে লাগিলেন। অতএব মাদৃশ ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মশাস্ত্রশ্রবণপরায়ণ ব্যক্তি কি প্রকারে তাঁহার পিণ্ড লোপ করিবে? আর অধিরথও আমাকে পুত্র বলিয়া অবগত আছেন এবং আমিও সৌহার্দ্দবশতঃ তাঁহাকেই পিতা বলিয়া জানি। তিনি অপত্যস্নেহানুসারে শাস্ত্রানুগত বিধি দ্বারা আমার জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করিয়া আমার নাম বাসুসেন রাখিলেন। অনন্তর আমি যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়া দার পরিগ্রহ করিলাম; তাঁহাদের হইতে আমার পুত্র পৌত্র সকল জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে এবং আমার হৃদয় সেই সকল ভার্য্যাতে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। অখণ্ড ভূমণ্ডল বা রাশীকৃত সুবর্ণের বিনিময়ে, হর্ষ বা ভয়ে এই সকল অন্যথা করিতে আমার সামর্থ্য নাই।[১]

ইহার সহিত তুলনা করিলেই রবীন্দ্রনাথের কর্ণের মুখের ঐ উক্তির অস্বাভাবিকতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। উহা হইতে অতি-নাট্যিক আবেগ, উচ্ছ্বাস ও ভাবপ্রবণতাই কর্ণ চরিত্রের বিশেষত্ব বলিয়া ধারণা হয়। কিন্তু কর্ণের প্রকৃত রূপ ইহা নহে। নিয়তির কাছে বহুবারই হয় তো তাঁহাকে মাথা নত করিতে হইয়াছে, তথাপি আপন প্রতিষ্ঠা বেদীমূলে কর্ণ নিজে কখনও এমন করিয়া কুঠারাঘাত করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের কাছেও কর্ণের সে-পৌরুষদীপ্ত পরিচয় অজ্ঞাত ছিল না। তাই আপন কবি-স্বভাবের বশে অতিরিক্ত মাতৃস্নেহাতুর-রূপেই তাঁহার পরিচয় উদ্ঘাটিত করিলেও কর্ণের ধর্ম্মাশ্রিত বলবীর্য্যসম্পন্ন অন্যতর মহিমা ও শক্তির প্রকাশকেও তিনি উপেক্ষা করেন নাই। কুন্তী আজ তাঁহার কাছে প্রার্থিনীরূপে উপস্থিত, ইহা জানিতে পারিয়া কর্ণ বলিয়াছেন,—

ভিক্ষা, মোর কাছে!
আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া আর
যাহা আজ্ঞা করো দিব চরণে তোমার।

ইহার পরও মাতৃদত্ত প্রতিশ্রুতির সমস্ত প্রলোভন ত্যাগ করিয়া অবিচলিত ধর্ম্মনিষ্ঠার সঙ্গে তাঁহাকে বলিতে শোনা যায়,—

সিংহাসন! যে ফিরালো মাতৃস্নেহপাশ
তাহারে দিতেছ মাতঃ, রাজ্যের আশ্বাস!

১। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত: উদ্যোগপর্ব্ব, উনচত্বারিংশদধিক-শততম অধ্যায়

একদিন যে সম্পদে করেছ বঞ্চিত
সে আর ফিরায়ে দেওয়া তব সাধ্যাতীত।
মাতা মোর, ভ্রাতা মোর, মোর রাজকুল
এক মুহূর্ত্তেই মাতঃ, করেছ নির্মূল
মোর জন্মক্ষণে। সূতজননীরে ছলি
আজ যদি রাজজননীরে মাতা বলি—
কুরুপতি-কাছে বদ্ধ আছি যে বন্ধনে
ছিন্ন করে ধাই যদি রাজসিংহাসনে—
তবে ধিক্ মোরে।

যে ধর্ম্ম ছিল কর্ণের পুরুষকার ও মনুষ্যত্বের নিদান সেই ধর্ম্মনিষ্ঠাকেই কবি অপূর্ব্ব মহিমায় এখানে বাণীবদ্ধ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, এই অংশে তিনি মহাভারতকারের অঙ্কিত চিত্রেরও উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। মহাভারতে দেখা যায় যে, সত্যপরায়ণ কর্ণ মাতা কুন্তী ও পিতা দিবাকরের বাক্যে নিজ জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই, বরং রূঢ় ভাষায় কুন্তীকে সম্ভাষণ করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

> ক্ষত্রিয়ে! আমি আপনার বাক্যে আস্থা করি না, আপনার বাক্যানুরূপ কার্য্য করিলে আমার ধর্ম্মহানি হইবে। দেখুন, আপনা হইতে আমার জাতিভ্রংশ হইয়াছে; আপনি তৎকালে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত অযশস্য ও কীর্ত্তিলোপকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। আমি ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনার নিমিত্তই ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সৎকার প্রাপ্ত হই নাই, অতএব আর কোন্ শত্রু আপনা অপেক্ষা আমার অধিক অপকার করিবে? আপনি ক্ষত্রসংস্কার প্রাপ্তিকালে আমার প্রতি তাদৃশ নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া এক্ষণে আমাকে আপনার কার্য্যসাধনে অনুরোধ করিতেছেন। আপনি পূর্ব্বে মাতার ন্যায় আমার হিত চেষ্টা না করিয়া এক্ষণে স্বকীয় হিত বাসনায় আমাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।[১]

১। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত: উদ্যোগপর্ব্ব, ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

মহাকবি কর্ণের মাতৃ-প্রত্যাখ্যানের মধ্যে অভিমানের যে তীব্রতা, জ্বালা এবং ক্ষোভের প্রকাশ দেখিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের গীতি-প্রবণ চিত্ত ও সূক্ষ্ম-শালীনতাবোধ উহাকে সেই আদিম অনাবৃত রূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই। কুন্তীর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের কর্ণের অভিযোগের গুরুত্বও উহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে—

কেন তবে
আমারে ফেলিয়া দিলে দূরে অগৌরবে
কুলশীলমানহীন মাতৃনেত্রহীন
অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে। কেন চিরদিন
ভাসাইয়া দিলে মোরে অবজ্ঞার স্রোতে,
কেন দিলে নির্বাসন ভ্রাতৃকুল হতে।

তথাপি ইহার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী কত স্বতন্ত্র। দুইটি যেন দুই ভিন্ন প্রকৃতির লোকের কথা। ইহার মধ্যে শুধু রবীন্দ্রনাথের রুচিগত পরিবর্ত্তনই নহে যুগ পরিবর্ত্তনের স্বাক্ষরও আছে। মহাভারতের যুগ আর রবীন্দ্রনাথের যুগের পার্থক্যই এই পরিবর্ত্তনকে অনেকখানি সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে।

কর্ণের চরিত্রের দৃঢ়তা ও বীরত্বগৌরব নাট্যকবিতাটির শেষভাগেই অধিকতর নিপুণতার সঙ্গে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। কর্ণ যুদ্ধফল কি হইবে তাহা জানিতেন, মহাভারতে এরূপ উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন,—

এই যে পৃথিবীর প্রলয়দশা সমুপস্থিত হইয়াছে, আমি, শকুনি, দুঃশাসন ও রাজা দুর্য্যোধন, এই চারিজন ইহার কারণ। পাণ্ডব ও কৌরবগণের এই ঘোরতর সংগ্রামে পৃথিবী রুধির দ্বারা কর্দ্দমিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। দুর্য্যোধনের বশীভূত রাজা ও রাজপুত্রগণ এই সমরে শস্ত্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া শমনসদনে গমন করিবেন। ভূরিভূরি দুঃস্বপ্ন, ঘোরতর দুর্নিমিত্ত ও নিদারুণ লোমহর্ষণ উৎপাত সকল যুধিষ্ঠিরের জয় ও দুর্য্যোধনের পরাজয় সূচনা করিতেছে।.... হে হৃষীকেশ! আমি জানি, যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়।[১]

১। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত: উদ্যোগ পর্ব্ব, চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

ইহারই সাদৃশ্যে কুন্তীকে সান্ত্বনা দিয়া কর্ণের মুখে রবীন্দ্রনাথও উচ্চারণ করাইয়াছেন,—

মাতঃ, করিয়ো না ভয়।
কহিলাম, পাণ্ডবের হইবে বিজয়।
আজি এই রজনীর তিমিরফলকে
প্রত্যক্ষ করিনু পাঠ নক্ষত্র আলোকে
ঘোর যুদ্ধফল। এই শান্ত স্তব্ধ ক্ষণে
অনন্ত আকাশ হতে পশিতেছে মনে
জয়হীন চেষ্টার সংগীত, আশাহীন
কর্মের উদ্যম—হেরিতেছি শান্তিময়
শূন্য পরিণাম।

কৌরব পক্ষের পরাজয় সুনিশ্চিত জানিয়াও যখন কর্ণকে বলিতে শুনি,—

যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান।
* * *
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে—
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে অয়ি,
বীরের সদ্গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।

তখন তাঁহার চরিত্রের ঋজু, বলিষ্ঠ, শৌর্য্যবীর্য্যে দীপ্ত, ধর্ম্মবোধে অনুপ্রাণিত, পুরুষকারসমন্বিত বিরাট প্রকাশ দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। ঐ উক্তিটির মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মবোধ ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় যেমন আছে তেমনি বীরত্ব গরিমার প্রকাশও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মাতৃনির্দ্দেশেও আশ্রয়দাতা দুর্য্যোধনকে চরম বিপদের মধ্যে ত্যাগ করিয়া সুখ-স্বর্গে প্রবেশ করিতে তিনি সম্মত হন নাই। এই সুদৃঢ় কর্ত্তব্যচেতনার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে বলিষ্ঠ পৌরুষ। তাই মাতৃপ্রণামীরূপে জীবনের সকল সম্পদ উৎসর্গ করিতেও যখন তাঁহার কোন দ্বিধা নাই, তখনও তিনি বীরের সদ্গতি এবং পৌরুষ ও ধর্ম্ম একান্তরূপে আঁকড়িয়া থাকিতে কঠোর সঙ্কল্পবদ্ধ। যাঁহার দানখ্যাতি ভুবনজোড়া তিনিও

শেষ পর্য্যন্ত পৌরুষ ও ধর্ম্মত্যাগ করিতে ভরসা পাইলেন না। বিনাশের বিরাট মুখব্যাদানের সম্মুখ হইতে আজ যদি তিনি মাতৃ-আজ্ঞায় দূরে সরিয়া দাঁড়ান তাহা হইলে বীরকুলে তাঁহার অপযশ হইবে। সেই অপযশ কর্ণের পক্ষে মৃত্যুরও বাড়া। মহাভারতে কর্ণ কুন্তীকে বলিয়াছিলেন,—

> দেখুন, কৃষ্ণ সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনকে অবলোকন করিলে কোন্ ব্যক্তি ভীত ও ব্যথিত না হয়? অতএব আজি যদি আমি পাণ্ডবগণের সমীপে গমন করিয়া তাহাদের পক্ষ হই, তাহা হইলে সকলেই আমাকে ভীত জ্ঞান করিবে। অদ্যাপি কেহই আমাকে পাণ্ডবগণের ভ্রাতা বলিয়া জানে না, অতএব যদি আমি এই যুদ্ধকালে তাহাদের সমীপে গমন করি, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণ আমাকে কি বলিবেন ?[১]

সেই কারণে পরাজিত পক্ষকে ত্যাগ করিবার এমন সাদর আহ্বান সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি কুন্তীর কাছে 'বীরের সদ্গতি'তে অবিচল নিষ্ঠা যাহাতে রক্ষা করিতে পারেন সেই আশীর্ব্বাদই প্রার্থনা করিলেন। পুরুষকার-প্রবুদ্ধ কর্ণের সেই প্রার্থনা রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি স্মরণ করাইয়া দেয়—

> দাও হস্তে তুলি
> নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
> তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
> রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
> ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
> কর মোরে সম্মানিত নববীরবেশে,
> দুরূহ কর্তব্যভারে দুঃসহ কঠোর
> বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
> ক্ষতচিহ্ন-অলংকার। ধন্য করো দাসে
> সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।[২]

১। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত : উদ্যোগপর্ব্ব ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।
২। দীক্ষা : নৈবেদ্য।

'শুধু এই আশীর্ব্বাদ দিয়ে যাও মোরে'—ইত্যাদি কথার সহিত উপরের কাব্যপংক্তিগুলি এমন নিবিড়ভাবে একসুরে বাঁধা যে, মাত্র দুই একটি শব্দ বদলাইয়া ঐ বাক্যগুলি কর্ণের মুখে বসাইয়া দিলেও মোটেই বেমানান হইত না।

ইহাই কর্ণের আসল পরিচয়। মহাভারত হইতে স্থানে স্থানে যে অংশগুলি উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, তাঁহার কাছে শ্রীকৃষ্ণ ও কুন্তীর দৌত্যকালে তাঁহাদের সহিত কথোপকথনের মধ্য দিয়া মহাভারতকার কর্ণের এমনই এক নিয়তিনির্জ্জিত অথচ পৌরুষদীপ্ত বিরাট মহিমময় মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কর্ণ চরিত্রের এই শক্তি-সংযম মূলক প্রত্যয়দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তিতে ঐ চিত্রেরই পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভারতের কর্ণের সহিত রবীন্দ্রনাথের কর্ণ চরিত্রের বিশেষ কোন পার্থক্য-কল্পনা এই ক্ষেত্রে ধরা পড়ে না। কিন্তু জননীর স্নেহবর্ষী কণ্ঠস্বর শুনিয়া যাঁহার কাছে রণহুঙ্কার, বীরখ্যাতি, জয়পরাজয় সমস্তই মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাঁহার চরিত্রে সহসা এমন নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপশিখার মত সুস্থির দার্ঢ্যের প্রকাশ স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া বিশ্বাস করিতে দ্বিধা জাগে।

রবীন্দ্রনাথের কর্ণ চরিত্রের দুর্ব্বলতা এইখানেই। 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যে অর্জ্জুনের চরিত্রেও এমনই বিপরীতধর্ম্মী দ্বৈত-রূপ দেখা দিয়াছে। চিত্রাঙ্গদার বাহ্য-রূপে আত্মহারা, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য, বনবাসী অর্জ্জুন বলিয়াছেন,—

খ্যাতি মিথ্যা,
বীর্য মিথ্যা আজ বুঝিয়াছি। আজ মোরে
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা
পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য
তুমি, এক নারী সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান, সকল কর্মের তুমি
বিশ্রাম-রূপিণী।

তথাপি সেখানেও যতটুকু কার্য্যকারণসূত্র দেখা যায় এখানে তাহারও অভাব। 'বিধির প্রথম দান এ বিশ্বসংসারে মাতৃস্নেহ', তাই মাতৃদর্শনের পর কর্ণের হৃদয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের যে প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া গিয়াছিল উহাকে আভাসিত করিবার জন্যই যে

রবীন্দ্রনাথ কর্ণের মাতৃস্নেহ-বুভুক্ষার উপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন তাহা বুঝা গেলেও কর্ণ চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে উহার সামঞ্জস্য না ঘটায় পাঠকের মনে কতকটা অতৃপ্তি থাকিয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—'কর্ণচরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর'।[১] রবীন্দ্রনাথ এই চরিত্রকে যতখানি মনোহর করিয়াছেন ততখানি মহৎ করিতে পারেন নাই।

'মহাভারতী'তে যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীও আধুনিক যুগ-মানসের উপযোগী করিয়া কর্ণ চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে তাহার একটু পরিচয় করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তীসংবাদ' যেখানে শেষ হইয়াছে যতীন্দ্রমোহনের যাত্রা উহার পর হইতে। কোন নির্দ্দিষ্ট কাহিনী, ঘটনা বা প্লট নয়, কর্ণের অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রটিই শুধু তাঁহার উপজীব্য হইয়াছে। মহাভারতের কর্ণ তাঁহার কল্পনেত্রে যে বিরাট ও মহান রূপ লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিল সেই মানস-মূর্ত্তিকেই তিনি কতকটা কল্পিত, কতকটা প্রাপ্ত কাহিনীর আশ্রয়ে বাহিরে রূপ দান করিয়াছেন। কর্ণের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অটুট রাখিয়া তাঁহার অন্তরের দ্বন্দ্ব-চিত্রটি যেভাবে একটি অভিনব সাহিত্য-রূপের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহাতে ঐ চরিত্রটি নূতন রস-রূপের আস্বাদনপ্রয়াসী আধুনিক পাঠকের অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিয়াছে অথচ মহাভারতের মূল আদর্শ হইতে কবিকল্পনা বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। কবিতাটি পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল পুরুষকারের সাধক কর্ণের বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মর্ম্মন্তুদ চিত্র পাঠকের মানস-পটে ভাসিয়া উঠে। আত্ম-ধর্ম্ম রক্ষার প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া তিনিও মাতাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। দৃঢ়চেতা কর্ণের সে-প্রত্যাখ্যানের ভাষাও বজ্রগম্ভীর—

নহে, কভু নহে—মানে না কর্ণ গুপ্ত সে অধিকার,—
কর্ণ পুরুষ, পৌরুষে শুধু স্বীয় ইতিহাস তা'র;
কোথা তা'র পিতা? মাতা তা'র নাহি;
একা সে চলেছে সম্মুখে চাহি'—
খড়্গ-খোদিত দুর্গম পথে বীর্য্যের অভিসার;
ধিক্‌কৃত কোনো দৈব অতীত কর্ণ মানে না তা'র।

১। দ্রষ্টব্য, 'কৃষ্ণচরিত্র, ৫ম-খণ্ড, ৮ম পরিচ্ছেদ

কিন্তু রক্তের ঋণের চেয়ে বড় ঋণ আর নাই। মুখের প্রত্যাখ্যানেই উহার সকল দায়-দায়িত্ব মুছিয়া যায় না। তাই এতখানি দৃঢ়তার সঙ্গে মাতৃ-আবেদন প্রত্যাখ্যানের পরও বিনিদ্র-রজনী যাপন করিয়া কর্ণকে বলিতে শোনা যায়,—

—হায় রে বিধাতা, কি দারুণ লিপি লিখিলি কর্ণ-ভালে !
সুর-নরে কেবা কোথা পড়িয়াছে হেন সঙ্কট-জালে ?
একদিকে কাঁদে মায়ের মিনতি ;
আরদিকে বাঁধে বন্ধু-বিনতি—
যে বন্ধু মোর অনন্যগতি আশ্রয় ইহকালে ;
ভাগ্য-বিধাতা, এ কি সঙ্কট লিখিলি কর্ণ-ভালে !

একদিকে মায়ের অশ্রুপ্লাবিত আঁখির কাতর নিবেদন, অন্যদিকে অন্নদাতা, আশ্রয়-দাতা বন্ধুর ঋণশোধের এবং নিজের বিড়ম্বিত জীবনের উপর বর্ষিত অজস্র গ্লানি, অপমানের প্রতিকার বিধানের সুকঠোর সঙ্কল্প তাঁহার মধ্যে যে সমাধানহীন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছে সংক্ষিপ্ত হইলেও উপরের কাব্যপংক্তিগুলির মধ্যে উহার চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে।

এমন ভাঙ্গা-মন ও আলোড়িতচিত্ত লইয়াও কর্ণ শেষ পর্য্যন্ত বীরভূষণে সজ্জিত হইয়া রণক্ষেত্রে যাওয়াই স্থির করিলেন। কেননা,—

প্রতিজ্ঞা মোর এ ভূমণ্ডলে রোধিবে সাধ্য কা'র ?
পার্থ-ভাগ্য ব্যর্থ করিয়া প্রতিশোধ লব তার।

কিন্তু, ঐ যাত্রার লগ্নে পুরুষকারদম্ভী কর্ণের কঠোর হৃদয়ও এক অদ্ভুত বস্তু দর্শনজনিত বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাঁহার সুদৃঢ় সঙ্কল্পের কঠোরতা ভেদ করিয়া সমগ্র জাগ্রত চৈতন্যের তলে তলে মাতৃমন্ত্র সংগোপনে কি অসাধ্য-সাধন করিয়া চলিয়াছিল ঐ দর্শনটির মধ্য দিয়া তাহারই প্রকাশ অপূর্ব্বসুন্দর হইয়া উঠিয়াছে—

—ওকি ! কা'র ছায়া উঠিল ফুটিয়া সমুখে মুকুর-'পরে ?
কর্ণ-জননী কুন্তী যে দেখি—নয়নে অশ্রু ঝরে !

পশ্চাতে ফিরি' হেরিলা চকিতে,—
কেহ তো কোথাও নাহি চারিভিতে।
—একি মোহময় মহা বিস্ময়! শিহরিল ক্ষণতরে;
মুকুরের মাঝে মিলাইল ছায়া আপন মুখের 'পরে!

যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বাহ্নে মুকুরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কর্ণ নিজের শৌর্য্যবীর্য্য-মণ্ডিত, বীরত্বগরিমায় উদ্ভাসিত মূর্ত্তিখানি একবার দেখিয়া লইতেছিলেন। সেইক্ষণে ঐ মুকুরে তিনি নিজের চেহারার বদলে কুন্তীর চেহারা দেখিলেন। পরে কুন্তীর ঐ মুখচ্ছবি হইতেই তাঁহার নিজের মুখাবয়ব জাগিয়া উঠিল। কর্ণের জীবনে এমন অঘটন পূর্ব্বে আর কখনও ঘটে নাই; ইহা তাঁহার কাছে 'মোহময় মহা বিস্ময়'ই বটে। কর্ণের অন্তর্দ্বন্দ্বের ব্যাপকতা ও জটিলতা এবং তজ্জনিত আত্মবিস্মৃতি ও তন্ময়তাকে বিজ্ঞাপিত করিতে যাইয়া যতীন্দ্রমোহনের ভাব-কল্পনা জীবন-সত্যের যে-গভীরে প্রবেশ করিয়া এমন নিখুঁত সাহিত্যিক সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে তাহা ভাবিয়া আমরাও কম বিস্মিত হই না। এই ব্যাপারটির সঙ্গে তুলনা দেওয়া যাইতে পারে এমন বর্ণনা হয় তো একমাত্র বৈষ্ণবসাহিত্যেই পাওয়া যাইতে পারে। কৃষ্ণভাবৈকপ্রাণা শ্রীমতীর প্রেমযোগে একাত্মানুভূতির পরিচয় প্রসঙ্গে ভক্ত বৈষ্ণব লিখিয়াছেন,—

> সঙ্কেত বংশী বাজিলেই বনে যাইতে হইবে, অতএব রাধা সমক্ষে দর্পণ রাখিয়া ইতোমধ্যে বেশভূষা তিলকাদি রচনা করিতেছিল। কিন্তু ধ্যান আছে কৃষ্ণে। দর্পণে নিজ মুখ দেখিতে দেখিতে বংশী শুনা গেল। সচকিত রাধা সহসা দর্পণে কৃষ্ণমুখ দেখিল—নিজ মুখ প্রতিবিম্ব না দেখিয়া কৃষ্ণমুখ দেখিল। আর কেহই দর্পণে এরূপ অলৌকিক দর্শন করে না, করে নাই, করিবে না।[১]

রবীন্দ্রনাথের মত যতীন্দ্রমোহনের বীর্য্যবৃত্ত কর্ণেরও সংগ্রামস্পৃহায় শৈথিল্য দেখা দিয়াছিল। যথা,—

যে কর্ণ কাছে কারো কোনো দিন
কোনো প্রার্থনা নহে ফলহীন,—

১। দ্রষ্টব্য, মোহিতলাল মজুমদার: সাহিত্য-বিচার, ২য় সংস্করণ, ১৩ পৃষ্ঠা।

পুত্র হয়ে সে জননীর ঋণ শুধিবে কি বাহুবলে ?
বীর্য্য তাহার কিসে পাবে পার মায়ের চোখের জলে ?

*　　*　　*

যে স্নেহ-নির্ঝর অন্তরগামী, রোধে না তো পর্ব্বত !
সম্মুখে মোর এই তো পেয়েছি শান্তির মহাপথ !

কিন্তু এখানেও উভয় কবির কল্পনার পার্থক্য কম নহে। মায়ের আহ্বানে অন্তরাত্মা জাগিয়া উঠায় রবীন্দ্রনাথের কর্ণ রণহিংসা, বীরখ্যাতি, জয়পরাজয় সমস্তই মিথ্যা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যতীন্দ্রমোহনের কর্ণ ভাগ্যের কাছে ঠকিয়া ঠকিয়া জয় পরাজয়কে তুল্যমূল্য দিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার জীবন-পরিক্রমার পথে তিনি দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির এক নিদারুণ চক্রান্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে শুধু মুকুরেই যে কুন্তীর মুখদর্শন ঘটিয়াছিল তাহা নয়, রথে আরোহণ করিবার মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্র তাঁহার কাছে স্বর্ণ কুণ্ডল ও কবচ প্রার্থনা করিলেন। দানবীর কর্ণ প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করিতে ক্ষণমাত্র ইতস্তত করিলেন না। কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিলেন যে, এ সমস্তই ভাগ্যের ছলনা ! স্বর্গ, মর্ত্ত্য, এমন কি নিজের হৃদয় জুড়িয়া পৌরুষের বিরুদ্ধে একাদিক্রমে ভাগ্যের এমন নির্ম্মম চক্রান্ত চাক্ষুষ করিয়াই জয়-পরাজয়ের মূল্য সম্পর্কে তাঁহার মনে ঐ ঔদাসীন্যের রঙ লাগিয়াছিল। যতীন্দ্রমোহন নীচের স্তবকবন্ধটিতে কর্ণ চরিত্রের সেই বিমূঢ় ভাবের অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি দান করিয়াছেন।—

কবচের সাথে কুণ্ডল বীর ছিঁড়িতে কঠিন হাতে—
আকর্ণ ভরি' অদ্ভুত হাসি দেখা দিল অজ্ঞাতে !
মনে মনে ভাবে—এই তো সুযোগ—
স্বর্গে মর্ত্ত্যে যেথা অভিযোগ,
শক্তি সেখানে শুধু দুর্ভোগ অমোঘ ভাগ্য-হাতে !
কর্ণের মুখে অদ্ভুত হাসি দেখা দিল অজ্ঞাতে।

অভিশপ্ত, নিয়তিলাঞ্ছিত যে জীবন-স্যন্দনখানিকে কর্ণ সর্ব্বপ্রযত্নে এতদিন সম্মুখপানে চালাইয়া লইয়া যাইতেছিলেন উহার চাকা যে সর্ব্বাধিক প্রয়োজনের

মুহূর্ত্তেই ঠিক ভূমিতে বসিয়া যাইবে কর্ণ তাহার সহস্র প্রমাণ যেন ইতিমধ্যেই পাইয়াছেন। তাঁহার স্বচ্ছ দৃষ্টি যেন রহস্য-যবনিকারঅন্তরালবর্ত্তী জীবনের শেষ পরিণতি দেখিতে পাইয়াছে। জননী কুন্তীর মধ্যেই নিয়তি সাবয়ব হইয়া উঠিয়াছে জানিতে পারায় তাঁহার কাছে জীবনের সকল সাধ ও সঙ্কল্পই উদ্দেশ্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। এখানে অধ্যাপক প্রমথ নাথ বিশীর একটি মন্তব্য উদ্ধার করিতেছি। কথাটি অবশ্য তিনি বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের কর্ণ চরিত্র সম্পর্কে, কিন্তু, আমাদের বিশ্বাস যতীন্দ্রমোহনের কর্ণ সম্বন্ধেই উহা অধিক সত্য হইতে পারিত। তিনি লিখিয়াছেন,—

> সে (কর্ণ) জানে না যে শ্রেষ্ঠ রাজকুলে তাহার জন্ম, অর্জ্জুন তাহার ভ্রাতা। বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ তাহার জীবনের চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আজ বহু বৎসর অপেক্ষার পরে সেই সুযোগ প্রত্যাসন্ন; আগামী কল্যই তাহার কীর্ত্তিসৌধের উপর শেষ প্রস্তরখানা বসাইবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে নিদারুণ বিধি বলিয়া গেল—ভুল! ভুল! সমস্তই ভুল! কুন্তী তোমার মাতা, অর্জ্জুন তোমার ভ্রাতা। * * * যথাকালে যে পরিচয় সৌভাগ্যের চরম হইতে পারিত কালাত্যয়ে সেই পরিচয় আসিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিল। [১]

তাই আজ আর কর্ণের কোন কিছুতেই কোন আক্ষেপ-অনুতাপ-বেদনার চিহ্নমাত্র নাই, আছে শুধু ট্র্যাজেডীর নায়কের ন্যায় এক বিমূঢ় জিজ্ঞাসা,—সকল সচেতন ও শুভ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া কেন ঘটে জীবনের এমন নিদারুণ পরাজয়? তাঁহাকে বলিতে শুনি,—

—চালাও শল্য, ত্বরা লহ রথ—যেথা সে পার্থ আছে;
শেষ প্রণিপাত লহ দিননাথ আজি কর্ণের কাছে;
　　—সবই তো সমান—জয় পরাজয়—
　　অর্জ্জুন-বধ—আত্ম-বিলয়!
—ভাগ্যের হাতে সবই অভিনয়—কর্ণ তা' বুঝিয়াছে;
—চালাও শল্য—দ্রুত, দ্রুততর,—পার্থ যেথায় আছে॥

১। রবীন্দ্র-নাট্য প্রবাহ, ১ম খণ্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা, ১ম সংস্করণ

অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কর্ণার্জ্জুন (১৯২৩) নাটকেও কর্ণের অনিবার্য্য পতনের মধ্যে নিয়তির নির্ম্মম পরিহাসের এই কল্পনাটি প্রশ্রয় পাইয়াছে। সেখানে কর্ণ বলিয়াছেন,—

রে অর্জ্জুন!
এতদিন করিয়াছি হিংসার পোষণ
আজি দেখি ব্যর্থ সব।
তুমি বটে কুন্তী-পুত্র,
আমি চিরদিন রাধার নন্দন;
অদ্ভুত অদৃষ্টলিপি!
মাতা, নহে পরিচয়—
নিজ হস্তে মৃত্যু দিয়ে গেলে মোরে! [১]

এই মনোভঙ্গীটির সহিত কর্ণের 'মিথ্যা মনে হয় রণহিংসা, বীরখ্যাতি জয়-পরাজয়' ইত্যাদি কথার বিশেষ কোনই সাদৃশ্য নাই। অথচ কর্ণ চরিত্রের চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে ইহাই সর্ব্বাধিক সার্থক কল্পনা। কর্ণের মুখে যে 'আকর্ণ ভরি' অদ্ভুত হাসি দেখা দিল অজ্ঞাতে' যতীন্দ্রমোহন উহার মধ্যেই তাঁহার জীবনের চরম শূন্যগর্ভতা, নিয়তির কাছে পুরুষকারের নিদারুণ পরাজয়ের কাতরতা সম্বন্ধে তাঁহার সচেতনতাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

কৃষ্ণের মুখে আপন জন্মরহস্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদের 'নর-নারায়ণ' নাটকেও কর্ণ বলিয়াছেন,—

স্বর্গ-মূল্যহীনকরা এই উপহার—
ভ্রাতৃত্ব তোমার, লইতে অশক্ত আমি।
প্রতিযোদ্ধাজ্ঞানে, এতকাল যার বধে
নিশিদিন করিয়াছি উপায় কল্পনা—
অদৃষ্টের তীব্র পরিহাস—
আজ সে আমার কৃষ্ণ কনিষ্ঠ সোদর!
দূর হতে যারে দেখে প্রমত্ত কামনা
ছুটিবে বাঁধিতে বক্ষে মুগ্ধ আলিঙ্গনে,

১। কর্ণার্জ্জুন, ৫ম অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য

হে প্রিয়, হে প্রিয়তম—
এক হস্ত বক্ষে দিয়া,
অন্য বাহু প্রসারিয়া,
বিঁধিতে হইবে মোরে মর্ম্মহীন শরে—
প্রাণাধিক সে ধনঞ্জয়ে!
মর্ম্ম চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়,
মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা—বাসুদেব!
মর্ম্ম-ভাঙ্গা প্রীতিপুষ্প অঞ্জলিতে ধরি',
শুনাতে আসিলে তুমি!
মনঃক্ষোভ কথা! [১]

অর্জ্জুনের প্রতি শর-সন্ধানে ব্যর্থ হইয়া রণস্থলে মগ্ন রথে পৃষ্ঠ দিয়া উপবিষ্ট কর্ণ অতঃপর বলিয়াছেন,—

পেয়েছিনু জীবনের সর্ব্ব উপাদান,
মৃত্যু ও আমার মধ্যে ছিল কি অলঙ্ঘ্য
ব্যবধান!—কোন ছিদ্রপথে প্রবেশিয়া
আমারে করিল মৃত্যু গ্রাস?—জন্ম—জন্ম—
অচ্ছিদ্র আম্রের মধ্যে লুক্কায়িত কীট—
ভ্রূণমত—জন্ম—জন্ম—এক বালিকার
ভুল মত্ত কৌতূহলে নির্লজ্জ লালসা!
জন্ম—জন্ম—একমাত্র রন্ধ্র পথ ছিল
ওইখানে! তাই আজ ওরে ও মরণ!
মগ্ন-রথে পৃষ্ঠ দিয়া, সমস্ত ভুলিয়া
বসে আছি। ওরে ও মরণ—বিস্মরণে
জন্ম তোর—তুই এলি—জন্মের লাঞ্ছনা-
স্মৃতি মুছাতে নারিলি। চারিদিকে শূন্য—
মধ্যে আমি—আমার অন্তরে প্রবেশিয়া
ব্যঙ্গ করে বিরাট শূন্যতা! [২]

১। নর-নারায়ণ, ২য় অঙ্ক, ৪র্থ দৃশ্য
২। ঐ , ৪র্থ অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য

গীতিপ্রেরণার প্রাবল্যবশেই রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-চরিত্র এইরূপ ট্রাজিক গুণোপেত হইয়া উঠিতে পারে নাই।

মহাভারতে কুন্তী দুর্ব্বোধ্যতার আবরণে আচ্ছাদিত। সত্যবতীর কুমারী অবস্থায় পরাশরের ঔরসে এবং তাঁহার গর্ভে স্বয়ং বেদব্যাসের জন্ম যে সমাজে কোন আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই সেই সমাজে কানীন পুত্র কর্ণকে লইয়া কুন্তীর এত লুকাচুরি করিবার হেতু সহজবোধ্য নহে। রবীন্দ্রনাথ বহু প্রাচীন দুরূহ বিষয়কে সর্ব্বজনহৃদয়গ্রাহী প্রাঞ্জল অর্থগৌরবে মণ্ডিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও এখানে নীরব। কর্ণ ও কুন্তীর আলোচ্য সাক্ষাৎকারের মধ্যে মহাভারতকার কুন্তী চরিত্রের যে পরিচয় দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ প্রধানত ঐ ঘটনাটির সাহায্যেই কুন্তীর রূপ কতকটা সম্পূর্ণতর ও উন্নততর করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহার প্রয়োজনে মহাভারতের কর্ণ-কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার কালে কৃষ্ণের মুখে উচ্চারিত অনেক কথাই তিনি কুন্তীর মুখে বসাইয়া দিয়াছেন। তাহা ছাড়া মহাভারতে কুন্তীর কর্ণ সাক্ষাৎকারের ঘটনায় মাতৃত্ব অপেক্ষা দৌত্যকার্য্যের উপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কুন্তী যখন বুঝিলেন যে, তাঁহার কর্ণসকাশে আগমন আশানুরূপ সুফলপ্রদায়ী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই তখন বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে শোকাকুলা কুন্তী কম্পিত দেহে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছেন,—

> কর্ণ, তুমি যা বললে তাই হবে, কুরুকুলের ক্ষয় হবে, দৈবই প্রবল। অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য চার ভ্রাতাকে তুমি অভয় দিয়েছ এই প্রতিজ্ঞা মনে রেখো।[১]

এখানে কুন্তীর চরিত্রে—সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ—এই মূল্যবান মহাজন বাক্যটিরই সমর্থন মিলিতেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার চরিত্রে এমন কূট রাজনৈতিক দৌত্যের কোন দুরভিসন্ধি আরোপ করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টিতে সন্তান-বাৎসল্যই কুন্তীর জীবনের প্রধান নিয়ন্ত্রণশক্তি ও সৌন্দর্য্যরূপে ধরা দিয়াছে। কর্ণ ছাড়াও তিনি পঞ্চ পুত্রের জননী। তথাপি ঐ বঞ্চিত, পরিত্যক্ত পুত্রের জন্য তাঁহার অসীম ব্যাকুলতা কোন দিনই প্রশমিত হয় নাই। উপরন্তু স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত্ত সন্তান-স্নেহের সঙ্গে

১ রাজশেখর বসু: মহাভারতের অনুবাদ: উদ্‌যোগপর্ব্ব, ভগবদ্‌যানপর্ব্বাধ্যায়।

অপরাধ-বোধ জড়িত হইয়া কর্ণের প্রতি তাঁহার আকর্ষণকে আরও গভীর ও তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। হৃদয়ের সেই অধীর ব্যাকুলতার চিত্রটি পাই নিম্নের পংক্তিগুলিতে,—

ত্যাগ করেছিনু তোরে,
সেই অভিশাপে পঞ্চপুত্র বক্ষে ক'রে
তবু মোর চিত্ত পুত্রহীন; তবু হায়
তোরি লাগি বিশ্বমাঝে বাহু মোর ধায়,
খুঁজিয়া বেড়াই তোরে। বঞ্চিত যে ছেলে
তারি তরে চিত্ত মোর দীপ্ত দীপ জ্বেলে
আপনারে দগ্ধ করি করিছে আরতি
বিশ্বদেবতারে।

এই উক্তির সাহায্যে কবি কুন্তীকে মাতৃত্বগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার ত্যাগের গৌরবও স্বল্প নহে। এতদিন পরে বাঞ্ছিত পুত্রের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে শুধু বুকে তুলিয়া লইয়াই আপন হৃদয়-গহনের গোপন জ্বালা দূর করিবার মত স্বার্থপরতারও উর্দ্ধে তিনি। লজ্জাসঙ্কোচের অধীন হইয়া দীর্ঘকাল কর্ণের প্রতি যে অন্যায় করিয়া আসিতেছেন উহার সংশোধনের শেষ মুহূর্ত্ত সমুপস্থিত জানিয়াই যেন তিনি আসিয়াছেন কুলশীলের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া পুত্রকে আপন মর্য্যাদায় ও অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে। চরম সর্ব্বনাশকে আসন্ন দেখিয়াই লজ্জাসঙ্কোচে জলাঞ্জলি দিয়াও মরীয়া হইয়া কর্ণের সহিত মোকাবিলা করিবার মত সাহস তিনি সঞ্চয় করিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন, 'It is better late than never'. ঐ শঙ্কিত আশায় বুক বাঁধিয়া তাই তাঁহাকে বলিতে শুনি,—

তোরে লব বক্ষে তুলি
সে সুখ-আশায় পুত্র আসি নাই দ্বারে।
ফিরাতে এসেছি তোরে নিজ অধিকারে।
সূতপুত্র নহ তুমি, রাজার সন্তান;
দূর করি দিয়া বৎস, সর্ব অপমান,
এসো চলি যেথা আছে তব পঞ্চভ্রাতা।

ইহার মধ্যে কুন্তীর সান্ধ্য-অভিযানের উদ্দেশ্যটি স্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ চিন্তাই তাঁহাকে এই অভিযানের প্রেরণা দান করিয়াছিল। দৌত্য-কার্য্য সাধন বা অন্য কোন উদ্দেশ্য ইহাকে প্রভাবিত করে নাই। এমন কি, আপন বুভুক্ষিত অন্তঃকরণকেও তিনি অদ্ভুত কৌশলে সংযমিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কুন্তী-চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও অনন্যতার উৎস ইহাই। মূল মহাভারতে আছে, ধৃতরাষ্ট্রের কাছে শ্রীকৃষ্ণের শান্তি প্রচেষ্টার দৌত্য এবং কর্ণকে প্রলুব্ধ করিয়া পাণ্ডব শিবিরে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে কুন্তী কর্ণ সকাশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুন্তীও কর্ণকে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন নাই, তবু ইহাতেও শ্রীকৃষ্ণের কূট মন্ত্রণা অন্যরূপে সিদ্ধ হইয়াছিল। কর্ণের মধ্যে স্বভাবতই যে এক প্রকার মিষ্টিক চেতনা ও অদৃষ্টবাদ ধীরে ধীরে উন্মেষ প্রাপ্ত হইতেছিল এই সাক্ষাৎকারে তাহা অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে। ফলে তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ়তাসহকারে পাণ্ডবগণের শত্রুতা করা আর সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথের কুন্তীর মধ্যে তেমন কোন কূট অভিসন্ধির দূরতম ইঙ্গিতও অনুপস্থিত।

প্রথম জীবনের ভুলের অঙ্কুরটিই যে আজ এই বিরাট বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়া কুন্তী অত্যন্ত বিমূঢ় ও স্তম্ভিত হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার মত নারীর পক্ষে স্বাভাবিক। তাই কর্ণের কাছে কোনরূপ প্রতিশ্রুতি আদায় কারবার মত মনোবল বা রুষ্ট হইয়া কটূক্তি বর্ষণ করিবার মত সমর্থন তিনি নিজের মধ্যে পাইলেন না। শুধু পরিতাপ-জর্জ্জর অন্তরে আপন ভাগ্যকেই ধিক্কৃত করিয়াছেন।—

হায় ধর্ম, এ কী সুকঠোর
দণ্ড তব। সেইদিন কে জানিত হায়,
ত্যজিলাম যে শিশুরে ক্ষুদ্র অসহায়,
সে কখন বলবীর্য লভি কোথা হতে
ফিরে আসে একদিন অন্ধকার পথে,
আপনার জননীর কোলের সন্তানে
আপন নির্মম হস্তে অস্ত্র আসি হানে
এ কী অভিশাপ!

অনুতাপদগ্ধ অন্তরে শান্ত, সংযতভাবে অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্তকারিণী নারীর রূপই রবীন্দ্রনাথের কুন্তীর রূপ। কুন্তী স্নেহদুর্ব্বল, সামাজিক সংস্কারপাশবদ্ধ, শঙ্কা ও শরমে জড়িত, নিদারুণ অসহায় এক নারী মাত্র। অপূর্ব্ব কৌশলে কবি তাঁহার এই রূপটিপ্রথমেই পাঠকের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। এবং এই উদ্দেশ্যের প্রয়োজনে তিনি মূলের পরিবর্ত্তন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। পূর্ব্বে তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করা গিয়াছে। এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তনের কথা বলা যাইতেছে। মূলে পাওয়া যায়,—

> কর্ণ পূর্ব্বমুখে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বেদপাঠ করিতেছেন। পাণ্ডুপত্নী পৃথা আতপ তাপে নিতান্ত তাপিত হইয়াছিলেন, কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে উত্তরীয় ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার জপাবসান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মহানুভব কর্ণ অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বমুখে জপ করিয়া পরিশেষে পশ্চিমাভিমুখ হইবা মাত্র কুন্তীকে অবলোকন করিলেন। তখন তিনি বিস্মিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'ভদ্রে! রাধাগর্ভসম্ভূত, অধিরথের ঔরসজাত কর্ণ আপনাকে অভিবাদন করিতেছে; আপনি কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে?' [১]

রবীন্দ্রনাথ মধ্যাহ্ন সবিতার পরিবর্ত্তে কর্ণকে দিয়া সন্ধ্যা-সবিতার বন্দনা করাইয়াছেন। আপন সন্তানের কাছে নিজের মুখে নিজের পাপজীবনের কথা বলিতে হইবে ভাবিয়া কুন্তীর হৃদয় কুণ্ঠায় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। কবি আপন প্রাণের সহমর্ম্মিতার আলোকেই কুন্তীর সেই ব্রীড়ানত ভাবটি প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন। তাই কর্ণের—

> কহো মোরে,
> জন্ম মোর বাঁধা আছে কী রহস্যডোরে
> তোমা-সাথে, হে অপরিচিতা।

১। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত: উদ্যোগপর্ব্ব, একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

এই ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ কুন্তীকে দিয়া বলাইয়াছেন,—

ধৈর্য ধর্
ওরে বৎস, ক্ষণকাল। দেব দিবাকর
আগে যাক অস্তাচলে। সন্ধ্যার তিমির
আসুক নিবিড় হয়ে।

এই কালঘটিত পরিবর্ত্তনের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ শুধু কুন্তী চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনই করেন নাই ভিন্নতর এক প্রয়োজনও সিদ্ধ করিয়াছেন। নিয়তির ভীমকান্তরূপদর্শী কর্ণের বিস্ময়বিমূঢ় অবস্থাটি গীতিকাব্যিকে সৌন্দর্য্যসুষমায় প্রকাশ করিবার জন্য ঐ সান্ধ্য পরিবেশটি কবির বড়ই কাজে লাগিয়াছিল। দিবসের কর্ম্মচাঞ্চল্য রাত্রির আগমনে ধ্যানগম্ভীর প্রশান্তিতে মগ্ন হইয়া যায়। যামিনীর শান্তিবাণী মন্ত্রবলে সকল প্রয়াস স্তব্ধ করিয়া বিশ্বকর্ম্ম-কোলাহলকে প্রশমিত করে—'জীব-লোক-মাঝে আনে মরণের বিপুল আভাস'।[১] এই প্রাকৃতিক-দৃষ্টান্তের সাদৃশ্যযোগে কর্ম্মময় জীবনের অবসানজ্ঞাপক লিপিটি রবীন্দ্রনাথ কর্ণকে দিয়া রাত্রির তিমির ফলকে পাঠ করাইয়া যথেষ্ট সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও বাস্তববোধের পরিচয় দিয়াছেন।

॥ সতী ॥

বিনায়ক রাও ও রমাবাইয়ের একমাত্র কন্যা অমাবাই জীবাজির বাগ্‌দত্তা। জীবাজির আগমন প্রতীক্ষাধীন বিবাহ সভা হইতে বিজাপুর রাজের যবন সভাসদ্ অমাবাইকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে পর সে স্বেচ্ছায় তাহাকে পতিরূপে স্বীকার করিয়া তাহার সন্তানের মাতৃত্ব বরণ করে। কিন্তু ইহাতে বিনায়ক রাও ও জীবাজির সঙ্গে বিজাপুর রাজসভাসদের এমনই শত্রুতার সৃষ্টি হইল যাহার ফলে অমাবাইয়ের যবন স্বামী এবং জীবাজি উভয়কেই মৃত্যুর ক্রোড়ে শায়িত হইতে হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই 'সতী'র কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে।

যুদ্ধোত্তর শ্মশান দৃশ্যের মধ্যে এই নাট্যকবিতাটি আরম্ভ হইয়াছে। শ্মশানভূমিতে জীবাজির শেষকৃত্য সম্পন্ন হইতেছিল। এমন সময়ে তথায়

১। কাহিনী : ভাষা ও ছন্দ

অমাবাইয়ের সহিত বিনায়ক রাও ও রমাবাইয়ের সাক্ষাৎ ঘটিবার পর হইতেই এই নাট্যকবিতার প্রকৃত দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে।' বিনায়ক রাও কন্যাকে স্বধর্ম্মে ও স্বসমাজে ফিরাইয়া আনিতে উৎসুক। কিন্তু রমাবাইয়ের ইচ্ছা ভিন্ন প্রকার। সে প্রথমে কন্যাকে জীবাজির চিতায় সহমৃতা হইয়া সতীত্ব গরিমাকে কলঙ্কমুক্ত করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছে। সেই উপদেশ বাক্যে ফল না হওয়ায়, শেষ পর্য্যন্ত সে সৈন্যদের সাহায্য লইয়াও ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। বিনায়ক রাও সতীধর্ম্মের এই নিষ্ঠুরতার কবল হইতে শত চেষ্টায়ও কন্যাকে রক্ষা করিতে পারিল না। ইহাই এই নাট্যকবিতার ঘটনাধারা।

ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পত্রিকায় মারাঠি গাথা সম্বন্ধে অ্যাকওয়ার্থ সাহেবের একটি প্রবন্ধ হইতে রবীন্দ্রনাথ 'সতী'র উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। অন্যত্র যেমন, এখানেও তেমনি কবি হুবহু মূলের অনুসরণ করেন নাই বলিয়াই আমাদের অনুমান। এইরূপ ধারণার মূল, চরিত্রগুলির অস্বাভাবিকতায়। রবীন্দ্রনাথ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন,—'সমাজের চেয়ে হৃদয়ের নিত্যধর্ম সত্য চিরদিন'। আচার যেখানে ধর্ম্মকে অভিভূত করিয়া বড় হইয়া উঠে সেখানেই সে মানুষের চিত্তকে রুদ্ধ করে। সেই রুদ্ধ চিত্তের বেদনাই তিনি এই নাট্যকবিতায় প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। ফলে মূল ব্যালাডটির সহিত তত্ত্বঘটিত পার্থক্য ঘটা অসম্ভব নয়।

সমস্যা একরূপ না হইলেও 'সতী'র কাহিনীর সহিত 'গোরা' উপন্যাসের ললিতা-বিনয় কাহিনীর বাহ্য-সাদৃশ্য অনেকখানি। ব্রাহ্ম ও হিন্দুসমাজের ভিতরকার বিরোধ ললিতা-বিনয়ের মিলনের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা রূপে দেখা দিয়াছিল। তাহারা প্রেমের অপরিমেয় শক্তিবলে সমস্ত প্রতিকূলতা দূর করিয়া অবশেষে অক্ষয় গৌরবে তাহাদের মিলনকে সার্থক করিয়া তোলে; সমাজ ও ধর্ম্ম কাহাকেও লোপ না করিয়াও প্রেমকে বিজয়ী করিয়া তুলিতে সমর্থ হয়। সেই মিলন-মহিমার সৌন্দর্য্য ও শক্তির কথায় রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহা এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,—

> আজ আর ললিতা ও বিনয়ের মধ্যে সংকোচের অবকাশ ছিল না। তাহাদের উভয়ের জীবনে যে-একটি কঠিন সংকটের আবির্ভাব হইয়াছে তাহারই আহ্বানে তাহারা পরস্পরের সম্বন্ধকে সহজ করিয়া ও বড়ো করিয়া দেখিল—তাহাদের মাঝখানে কোনো

> আবেশের বাষ্প আসিয়া রঙিণ আবরণ ফেলিয়া দিল না। তাহাদের দুই জনের হৃদয় যে মিলিয়াছে এবং তাহাদের দুই জীবনের ধারা গঙ্গা-যমুনার মতো একটি পুণ্যতীর্থে এক হইবার জন্য আসন্ন হইয়াছে এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনামাত্র না করিয়া এ কথাটি তাহারা বিনীত গম্ভীরভাবে নীরবে অকুণ্ঠিতচিত্তে মানিয়া লইল। সমাজ তাহাদের দুইজনকে ডাকে নাই, কোনো মত তাহাদের দুইজনকে মেলায় নাই, তাহাদের বন্ধন কোনো কৃত্রিম বন্ধন নহে, এই কথা স্মরণ করিয়া তাহারা নিজেদের মিলনকে এমন একটি ধর্মের মিলন বলিয়া অনুভব করিল, যে ধর্ম অত্যন্তবৃহৎভাবে সরল, যাহা কোনো ছোটো কথা লইয়া বিবাদ করে না, যাহাকে কোনো পঞ্চায়েতের পণ্ডিত বাধা দিতে পারে না। [১]

'গোরা'র সমস্যা অপেক্ষাকৃত সহজ—'মানুষের ধর্ম বিশ্বাস সমাজ যাই থাক্ না, সে-সমস্ত লোপ করে দিয়েই তবে মানুষের পরস্পরের সঙ্গে যোগ হবে এ কথনো হতেই পারে না।' [২] তাহা ছাড়া হিন্দুধর্ম্মের অনন্ত স্নেহচ্ছায়া-শীতল উদার অঙ্গনটির আশ্রয় পাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ ঐ মিলন-পরিণতিকে এতখানি স্বাভাবিকতার সঙ্গে এমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু ততখানি সার্থকতার সঙ্গে 'সতী'র সমস্যা জাল উন্মোচন করিতে তিনি পারেন নাই। হিন্দুধর্ম্মের বিরাট শোষণ-শক্তিকে—'হিন্দুসমাজে যদি তিন শো তেত্রিশ কোটি মত চলতে পারে তবে তোমার মতই বা চলবে না কেন?' [৩] —উপেক্ষা করিয়া উহার দুর্ব্বলতার উপর অধিক চাপ্ দেওয়াতেই 'সতী'র ঘটনাধারা অস্বাভাবিক পথে আবর্ত্তিত হইয়াছে।

ইহার চরিত্র পরিকল্পনা অবাস্তব এবং কার্য্যকারণসম্পর্কহীন। অপহরণকারী বিধর্ম্মীকে পতিত্বে বরণ করিয়া কোন ব্রাহ্মণকন্যার, বিশেষত বিনায়ক রাও ও রমাবাইয়ের সন্তানের—পক্ষে পাতিব্রত্যের মহিমা কীর্ত্তন করা ভাবের সত্য হইলেও, ইহা যে-যুগের কাহিনী সে-যুগের জীবন-সত্যের সহিত ইহার সম্পর্ক

১। গোরা : রবীন্দ্ররচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪৬৬ পৃষ্ঠা

২। ঐ : ঐ ৪৬৫ পৃষ্ঠা

৩। ঐ : ঐ ৪৬৩ পৃষ্ঠা

অতিশয় ক্ষীণ বলিয়াই মনে হয়। অমাবাই যখন পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলে—,

পত্নী আমি, নহি সেবাদাসী।
বরমাল্যে বরেছিনু তাঁরে ভালোবাসি
শ্রদ্ধাভরে; ধরেছিনু পতির সন্তান
গর্ভে মোর, বলে করি নাই আত্মদান।
মনে আছে দুই পত্র একদিন রাতে
পেয়েছিনু অন্তঃপুরে গুপ্তদূতী হাতে।
তুমি লিখেছিলে শুধু, 'হানো তারে ছুরি।'
মাতা লিখেছিল, 'পত্রে বিষ দিনু পুরি,
করো তাহা পান।' যদি বলে পরাজিত
অসহায় সতীধর্ম কেহ কেড়ে নিত,
তা হলে কি এতদিন হত না পালন
তোমাদের সে আদেশ। হৃদয় অর্পণ
করেছিনু বীরপদে। যবন ব্রাহ্মণ
সে ভেদ কাহার ভেদ। ধর্মের সে নয়।
অন্তরের অন্তর্যামী যেথা জেগে রয়
সেথায় সমান দোঁহে।

তখন তাহার মুখে আমরা অতিরিক্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রিয় কোন আধুনিকার কথাই যেন শুনি। অমাবাইয়ের আচরণে আধুনিকতার আরও চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় অপরাধী পিতার জন্য বিধাতার কাছে তাহার ক্ষমা প্রার্থনায়। সেই উক্তিটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে।—

অন্যায় সমরে জিনি
স্বহস্তে বধিলে তুমি পতিরে আমার,
হায় পিতা, তবু তুমি পিতা! বিধবার
অশ্রুপাতে পাছে লাগে মহা অভিশাপ
তব শিরে, তাই আমি দুঃসহ সন্তাপ
রুদ্ধ করি রাখিয়াছি এ বক্ষঃপঞ্জরে।

তুমি পিতা, আমি কন্যা—বহুদিন পরে
হয়েছে সাক্ষাৎ দোঁহে সমর অঙ্গনে
দারুণ নিশীথে। পিতঃ, প্রণমি চরণে
পদধূলি তুলি শিরে লইব বিদায়।
আজ যদি নাহি পার ক্ষমিতে কন্যায়
আমি তবে ভিক্ষা মাগি বিধাতার ক্ষমা
তোমা লাগি পিতৃদেব।

জাতি-ধর্ম্ম-সমাজকে অস্বীকার করিয়া আত্মতৃপ্তির বাসনাকে নিত্যধর্ম্মের আসনে বসাইয়া এমন গৌরববোধ করার পোষাকী প্রবৃত্তি এ কালে খুব একটা লোভনীয় বস্তু হইয়া উঠিলেও সেকালে নিন্দনীয়ই ছিল। ভাবের দিক হইতে অমাবাইয়ের এই আচরণের যতখানি মূল্য জীবন-সত্যের দিক দিয়া ইহার ততখানি মর্য্যাদা নাই। মানুষকে বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য দুই কূলে সমতা রাখিয়া চলিতে হয়—একদিকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্ফূর্ত্তি, অন্য দিকে সমগ্রের সহিত সামঞ্জস্য সাধন।[১] যে প্রেম উন্মার্গগামী হইয়া সমাজ-সংসারের প্রতি কর্ত্তব্যবিমুখ হয় সে প্রেম বিধাতার দ্বারা অভিশপ্ত। ইহা কখনও কল্যাণসুন্দর, মঙ্গল-আশীর্ব্বাদধন্য হইয়া উঠিতে পারে না; অতএব ইহা অভিনন্দনেরও অযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' নামক প্রবন্ধে ভারতবর্ষীয় দৃষ্টিতে প্রেমের মঙ্গল আদর্শ বলিতে কি বুঝায় বিশদভাবে তাহার আলোচনা করিয়াছেন। অমাবাইয়ের প্রেমাদর্শের সহিত উহার পার্থক্য কোথায় তাহা বুঝাইবার জন্য উক্ত প্রবন্ধের সমাপ্তি অংশটুকু উদ্ধৃত করা যাইতেছে।—

১। সে (বিনয়) কহিল, 'ওই জায়গায় তোমার সঙ্গে বোধ হয় আমার মিল হবে না। আমি তো ব্যক্তির দিকে টেনে সমাজের বিরুদ্ধে কথা বলছিনে। আমি বলছি, ব্যক্তি এবং সমাজ দুইয়ের উপরেই একটি ধর্ম আছে—সেইটের উপরে দৃষ্টি রেখে চলতে হবে। যেমন, ব্যক্তিকে বাঁচানোই আমার চরম কর্তব্য নয় তেমনি সমাজকে বাঁচানোও আমার চরম কর্তব্য নয়, একমাত্র ধর্মকে বাঁচানোই আমার চরম শ্রেয়।'

গোরা কহিল, 'ব্যক্তিও নেই সমাজও নেই, অথচ ধর্ম আছে, এমন ধর্মকে আমি মানিনে।'

—গোরা : রবীন্দ্ররচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪২৩ পৃষ্ঠা

হারান কহিলেন, 'উচ্ছৃঙ্খলতাকে তুমি মুক্তি বল!'

ললিতা কহিল, 'না, নীচতার আক্রমণ থেকে, অসত্যের দাসত্ব থেকে মুক্তিকেই আমি মুক্তি বলি। যেখানে আমি কোনো অন্যায়, কোনো অধর্ম দেখছিনে সেখানে ব্রাহ্মসমাজ আমাকে কেন স্পর্শ করবে, কেন বাধা দেবে?' — ঐ : ঐ ৪০২ পৃষ্ঠা

একদিকে গৃহধর্মের কল্যাণবন্ধন, অন্যদিকে নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধন-মোচন, এই দুইই ভারতবর্ষের বিশেষ ভাব। সংসার-মধ্যে ভারতবর্ষ বহুলোকের সহিত বহু সম্বন্ধে জড়িত, কাহাকেও সে পরিত্যাগ করিতে পারে না; তপস্যার আসনে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ একাকী। দুইয়ের মধ্যে যে সমন্বয়ের অভাব নাই, দুইয়ের মধ্যে যাতায়াতের পথ, আদান-প্রদানের সম্পর্ক আছে, কালিদাস তাঁহার শকুন্তলা-কুমারসম্ভবে তাহা দেখাইয়াছেন। তাঁহার তপোবনে যেমন সিংহশাবকে নরশিশুতে খেলা করিতেছে তেমনি তাঁহার কাব্য-তপোবনে যোগীর ভাব, গৃহীর ভাব, বিজড়িত হইয়াছে। মদন আসিয়া সেই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া কবি তাহার উপর বজ্রনিপাত করিয়া তপস্যার দ্বারা কল্যাণময় গৃহের সহিত অনাসক্ত তপোবনের সুপবিত্র সম্বন্ধ পুনর্বার স্থাপন করিয়াছেন। ঋষির আশ্রমভিত্তিতে তিনি গৃহের পত্তন করিয়াছেন এবং নরনারীর সম্বন্ধকে কামের হঠাৎ আক্রমণ হইতে উদ্ধার করিয়া তপঃপূতনির্মল যোগাসনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সংহিতায় নরনারীর সংযত সম্বন্ধ কঠিন অনুশাসনের আকারে আদিষ্ট, কালিদাসের কাব্যে তাহাই সৌন্দর্যের উপকরণে গঠিত। সেই সৌন্দর্য শ্রী হ্রী এবং কল্যাণে উদ্ভাসমান; তাহা গভীরতার দিকে নিতান্ত একাগ্র এবং ব্যাপ্তির দিকে বিশ্বের আশ্রয়স্থল। তাহা ত্যাগের দ্বারা, পরিপূর্ণ দুঃখের দ্বারা চরিতার্থ; এবং ধর্মের দ্বারা ধ্রুব। সেই সৌন্দর্যে নরনারীর দুর্নিবার দুরন্ত প্রেমের প্রলয়বেগ আপনাকে সংযত করিয়া মঙ্গল মহাসমুদ্রের মধ্যে পরমস্তব্ধতা লাভ করিয়াছে—এই জন্য তাহা বন্ধনবিহীন দুর্ধর্ষ প্রেমের অপেক্ষা মহান্ ও বিস্ময়কর।[১]

এই প্রসঙ্গে অপর একজন ঋষিকল্প ব্যক্তির উক্তিও উদ্ধৃত করা যাইতেছে। নবীনের সহিত প্রবীণের জীবন-সাধনার উপায় ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—

একদিকে, নব্য ভারত-ভারতী বলিতেছেন, পতি-পত্নী-নির্ব্বাচনে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত; কারণ, যে বিবাহ

১। কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা: প্রাচীন সাহিত্য

আমাদের সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-দুঃখ, তাহা আমরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নির্ব্বাচন করিব। অপরদিকে, প্রাচীন ভারত আদেশ করিতেছেন, বিবাহ ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে, প্রজোৎপাদনের জন্য। প্রজোৎপাদন দ্বারা সমাজের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের তুমি ভাগী। অতএব যে প্রণালীতে বিবাহ করিলে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণ সম্ভব, তাহাই সমাজে প্রচলিত; তুমি বহু জনের হিতের জন্য নিজের সুখভোগেচ্ছা ত্যাগ কর।[১]

ভারতবর্ষের সমাজবন্ধন এবং উহার বিচিত্র নিয়ম-সংযম যে বৃহত্তর লক্ষ্য সাধনের উপায়রূপেই একদা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, এবং যথাযথভাবে উহার অনুসরণ করিয়া আমরা যে এখনও অশেষভাবে উপকৃত হইতে পারি তাহা দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্বাস করিতেন বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ লিখিতে পারিয়াছেন,—

যদি লক্ষ্য সজাগ থাকে, তবে নিয়ম-সংযমের বন্ধনই মুক্তির একমাত্র উপায়। ভারতবর্ষ একদিন নিয়মের দ্বারা সমাজকে খুব করিয়া বাঁধিয়াছিল। মানুষ সমাজের মধ্য দিয়া সমাজকে ছাড়াইয়া যাইবে বলিয়াই বাঁধিয়াছিল। ঘোড়াকে তাহার সওয়ার লাগাম দিয়া বাঁধে কেন, এবং নিজেই বা তাহার সঙ্গে রেকাবের দ্বারা বদ্ধ হয় কেন—ছুটিতে হইবে বলিয়া। ভারতবর্ষ জানিত, সমাজ মানুষের শেষ লক্ষ্য নহে, মানুষের চির-অবলম্বন নহে,—সমাজ হইয়াছে মানুষকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য। সংসারের বন্ধন ভারতবর্ষ বরঞ্চ বেশি করিয়াই স্বীকার করিয়াছে তাহার হাত হইতে বেশি করিয়া নিষ্কৃতি পাইবার অভিপ্রায়ে।[২]

গান্ধারীর মত অমাবাইয়েরও শেষ আশ্রয় হইয়াছে ধর্ম্ম। ধর্ম্মরাজের উদ্দেশেই সে শেষ প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছে।—

জাগো, জাগো, জাগো ধর্মরাজ।
শ্মশানের অধীশ্বর, জাগো তুমি আজ।

১। স্বামী বিবেকানন্দ: বর্ত্তমান ভারত
২। ধর্ম: রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ৪২৭ পৃঃ

হেরো তব মহারাজ্যে করিছে উৎপাত
ক্ষুদ্র শত্রু—জাগো, তারে করো বজ্রপাত
দেবদেব। তব নিত্যধর্মে করো জয়ী
ক্ষুদ্র ধর্ম হতে।

কিন্তু গান্ধারী চরিত্রের উদাত্ততা সেই ধর্মনিষ্ঠাকে যেরূপ গৌরবান্বিত করিয়াছে অমাবাইর ধর্মনিষ্ঠায় সেইরূপ উজ্জ্বল দীপ্তি নাই।

লিরিক উচ্ছ্বাস দ্বারা মূল উদ্দেশ্য কিছুটা আচ্ছন্ন হইলেও সতী-ধর্মের সমস্যা-পূরণই যে কবির মনোগত লক্ষ্য তাহা নাট্যকবিতাটির নামকরণ হইতেই বুঝা যায়। কোন বাগ্‌দত্তা রমণীর অপর কোন পুরুষকে (সে বিধর্মীও হইতে পারে) ভালবাসিয়া তাহার সহিত স্নেহপ্রেমজড়িত সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই সতীত্ব, না, বাগ্‌দত্ত পুরুষের সহিত আপন অদৃষ্টকে নির্ব্বিচারে একসূত্রে গাঁথিয়া দেওয়াতেই সতীত্ব রক্ষা পায়—ইহাই এই নাট্যকবিতার মূল সমস্যা। ইহার নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টিও ঐ সমস্যার পথেই হইয়াছে। বাগ্‌দান নিছক একটা সংস্কার মাত্র। এ ক্ষেত্রে অমাবাইয়ের মাতাপিতার অভিলাষের দ্বারা উহা নিয়ন্ত্রিত, তাহার ইচ্ছা অনিচ্ছার সহিত ইহার কোন যোগ নাই। অন্যদিকে হৃদয়ের নিত্যধর্ম প্রেম। অমাবাই সেই নিত্যধর্মের পূজারিণী। এই দুইয়ের মধ্যে হৃদয়ের নির্দ্দেশকেই কবি সতীত্ব-গৌরব দিয়া জয়ী করিতে চাহিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটক 'মেবার-পতন' (১৯০৯)-এর সহিত 'সতী'র কাহিনীগত কিছুটা মিল দৃষ্টিগোচর হয়। মেবারের সামন্ত গোবিন্দ সিংহের কন্যা কল্যাণী যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন তিনি পরে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মহাব্বৎ খাঁ উপাধি ধারণ করেন এবং মোঘল সৈন্যের সেনাপতিপদে বৃত হন। কল্যাণী পিতৃগৃহে থাকিয়াও স্বামীর উদ্দেশ্যে গোপনে প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে থাকেন। গোবিন্দ সিংহ কন্যার এই বিমুগ্ধ ভাবের কথা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত রুষ্ট হন এবং তাঁহার মন হইতে ধর্ম্মান্তরিত স্বামীর স্মৃতি মুছিয়া ফেলিবার জন্য নানা প্রকার উপদেশ বাক্য উচ্চারণ করিতে থাকেন; তখন কল্যাণী পিতাকে পত্নীর কর্ত্তব্য ও নারীধর্মের পবিত্রতার কথা বুঝাইবার ছলে নিজের আচরণ সমর্থন করেন। এই সাদৃশ্যের মধ্যেও অমাবাই ও কল্যাণীর চরিত্র-পরিকল্পনার পার্থক্য সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কল্যাণীর ক্ষেত্রে পত্নীর আদর্শ ও সতী-ধর্ম স্বভাবসুন্দর

পথ অনুসরণ করিয়া যেরূপ গৌরব লাভ করিয়াছে, অমাবাইয়ের ক্ষেত্রে সেরূপ হয় নাই। অমাবাইয়ের ধর্ম্মানুগত্য তাই আমাদের হৃদয় গভীরভাবে স্পর্শ করিতে পারে না।

বিনায়ক রাওয়ের চরিত্রও পূর্ব্বাপর সঙ্গতিহীন। দস্যু যবনের বুকে শাণিত ছুরি বসাইবার নির্দ্দেশ দিয়া যে কন্যার কাছে গোপন পত্র প্রেরণ করিয়াছিল, প্রতিজ্ঞামুক্ত হইবার জন্য এবং 'ধর্মেরে করিতে রক্ষা, দোষীরে দণ্ডিতে' দ্বিধাহীন চিত্তে যে কন্যার সৌভাগ্যডোর নিজ হস্তে ছিন্ন করিয়াছিল, তাহার মুখে বিগলিত হৃদয়ের স্নেহ-মন্দাকিনীর বিপুল উচ্ছ্বাসের কথা—

পিতৃস্নেহ নির্বিচার বিকারবিহীন
দেবতার বৃষ্টিসম, আমার কন্যারে
সেই শুভ স্নেহ হতে কে বঞ্চিতে পারে—
কোন্ শাস্ত্র, কোন্ লোক, কোন্ সমাজের
মিথ্যা বিধি, তুচ্ছ ভয়।

শুনিয়া পাঠক বিস্ময় বোধ না করিয়া পারেন না। এখানে চারিত্রিক সামঞ্জস্যের কোন পরিচয় নাই। তাহার সংসার-বৈরাগ্যের কথাও, যথা,—

এসো প্রিয়ে, মোরা দোঁহে
চলে যাই তীর্থধামে কাটি মায়ামোহে,
সংসারের দুঃখসুখ-চক্র-আবর্তন
ত্যাগ করি।

কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয়। এমন কথা তৃতীয় শ্রেণীর একখানি উপন্যাসের দুঃখজ্বালা-যন্ত্রণায় অধীর কোন নায়কের মুখে শোভা পাইলেও, বিনায়ক রাওয়ের মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে উচ্চারিত হওয়ার যোগ্য নহে। তাহা ছাড়া, যে কৃপাপ্রসন্ন দৃষ্টির বলে সে পত্নী ও কন্যাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতে পারিয়াছে,—

সে যে ফলে ফুলে
নব প্রাণে বিকশিত, নব নব মূলে
নূতন মৃত্তিকা ছেয়ে। সেথা তার প্রীতি,
সেথাকার ধর্ম তার, সেথাকার রীতি।

অন্তরের যোগসূত্র ছিঁড়েছে যখন
তোমার নিয়মপাশ নির্জীব বন্ধন
ধর্মে বাঁধিছে না তারে, বাঁধিতেছে বলে।
ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।—যাও বৎসে, চ'লে,
যাও তব গৃহকর্মে ফিরে ; যাও তব
স্নেহ-প্রীতি জড়িত সংসারে, অভিনব
ধর্মক্ষেত্র-মাঝে।

উহার সহিতও ঐ সংসার-বৈরাগ্যের কোন সম্পর্ক নির্দ্দেশ করা যায় না। ক্ষমাসুন্দর ঐ দৃষ্টি লাভের পর, নিজ হস্তে স্নেহ-পুত্তলির ভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত করিয়াছিল বলিয়া, সে যদি কন্যা ও দৌহিত্রকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিত ও স্বীকার করিয়া লইত এবং সংসারের আপদবিপদ, ঝড়ঝঞ্ঝা হইতে তাহাদের যাত্রাপথকে মুক্ত করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইত, তাহা হইলে উহাই বরং হইত স্বাভাবিক। এই আচরণই তাহার কাছে ছিল সর্ব্বাধিক প্রত্যাশিত। কোন চরিত্রই বাহিরের বিধি মানিয়া চিরকাল একই নিয়মে সরলরেখায় চলে না। ছোট বড় সকল চরিত্রের মধ্যেই আছে অজস্র অসঙ্গতি। তবু উহারা খেয়ালী ফসল নয়। চরিত্রের মৌলিক প্রেরণার সূত্রেই উহাদের আবির্ভাব বলিয়া বিচিত্র অসঙ্গতিও একটি মহৎ সঙ্গতিসুষমা লাভ করে। বিনায়ক রাওয়ের বিচিত্র ভাববিকাশের মধ্যে তেমন সম্পর্কসূত্র দেখা যায় না। সঙ্গতিহীনতাই এই চরিত্রের প্রধান দুর্ব্বলতা এবং এই কারণেই তাহার মধ্যে পিতৃধর্ম্ম ও সমাজধর্ম্মের বিবোধ যথেষ্ট সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।

বিনায়ক রাওয়ের তুলনায় রমাবাইয়ের চরিত্র বরং কতকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অনেকটাই স্বাভাবিক। যদিও তাহার মধ্যে 'milk of human kindness'-এর অভাব, তথাপি যে সমাজে নারীরা হাসিমুখে জহর-ব্রত পালন করিত, নিজ হাতে বিষ পান করাইয়া অরক্ষণীয়া কন্যার মৃত্যু সংঘটন করিতেও যে কালের মাতাপিতা কুণ্ঠিত হইত না বরং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিত এবং ধর্ম্মপালনের ন্যায় এক প্রকার আত্মপ্রসাদ লাভ করিত সেই কাল ও সমাজের পটভূমিকায় রমাবাইয়ের চরিত্র অবাস্তব বা অস্বাভাবিক নহে। তাহার ব্রাহ্মণ্যসংস্কার দৃঢ়মূল। ব্রাহ্মণ-কন্যা হইয়া ম্লেচ্ছ-গলায় বরমাল্য পরাইবার অপরাধের জন্য রমাবাই যে কন্যাকে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছে না তাহার মধ্যে কোন

উচ্চ ভাবের প্রকাশ না থাকিলেও, ভারতবর্ষীয় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর যে কতকটা প্রভাব পড়িয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এবং সেই কারণেই ইহা অবাস্তবও নহে। দুঃশীলা কন্যাকে জীবাজির চিতায় নিক্ষেপ করিয়া 'সতী'র মর্য্যাদা রক্ষায় সে সঙ্কল্পবদ্ধা। তাই স্বামীর তীর্থবাস সঙ্কল্পে সাড়া না দিয়া দৃঢ়তার সহিত তাহাকে বলিতে শুনি,—

তার আগে করিব ছেদন
আমার সংসার হতে পাপের অঙ্কুর
যতগুলি জন্মিয়াছে। করি যাব দূর
আমার গর্ব্বের লজ্জা। কন্যার কুযশে
মাতার সতীত্বে যেন কলঙ্ক পরশে।
অনলে অঙ্গার-সম সে কলঙ্ক কালি
তুলিব উজ্জ্বল করি চিতানল জ্বালি।
সতীখ্যাতি রটাইব, দুহিতার নামে
সতীমঠ উঠাইব এ শ্মশানধামে
কন্যার ভস্মের 'পরে।

গান্ধারীর মত সেও চিত্তের সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জয় করিয়াছে। গান্ধারী ন্যায়ধর্ম্মের প্রবক্ত্রী, সে সমাজধর্ম্মের সমর্থনকারিণী। সামাজিক সংস্কারবশে সতীত্বকেই সে নারী জীবনের চূড়ান্ত আদর্শ বলিয়া জানিয়াছে এবং উহার বিরোধী কোন ইচ্ছা অনিচ্ছা বা আদর্শের মূল্য বুঝিতে সে অক্ষম। কুন্তীর সহিতও তাহার তুলনা চলিতে পারে। কুন্তী লোকসমাজে নিজের লজ্জা ঢাকিবার জন্য কানীন পুত্রকে ত্যাগ করিয়া নারীধর্ম্ম ও মানবধর্ম্মকে আঘাত করিয়াছিলেন; রমাবাই নিজ গর্ব্বের লজ্জা দূর করিবার জন্য কন্যাকে সতী নারীর দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ করিতে চাহিয়াছে। উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও কম নহে। কুন্তী নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া কর্ণকে আপন স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় দিতে ছুটিয়া আসয়াছিলেন, কিন্তু রমাবাই কন্যাকে সংশোধনের অতীত মনে করিয়া তাহাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক্ষণে আমরা নাট্যকবিতাগুলির সাহিত্যিক সিদ্ধি সম্পর্কে আলোচনা করিব। সব কয়টি নাট্যকবিতাই যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে সে-কথা বলা চলে না। কোন কোনটির কিছু কিছু দুর্ব্বলতার কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। তথাপি রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের নাটকীয় আবেগ অনুভূতি যে, এই বিশিষ্ট রূপটিতেই সর্ব্বাধিক সার্থক হইয়া উঠিয়াছে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

॥ সতী ॥

সব কয়টি নাট্যকবিতার মধ্যে 'সতী'ই সর্ব্বাধিক দুর্ব্বল রচনা। কবি ইহার সমস্যাটিকে সোজাসুজি উত্থাপন করিতে না পারায় এবং এক বিশ্বজনীন পটভূমিতে দাঁড় করাইতে চাওয়ায় নাট্যকবিতাটির সংহতিসুষমা কতকাংশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে,—উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে নাই। চরিত্রসৃষ্টির ত্রুটির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু উহাই 'সতী'র একমাত্র ত্রুটি নহে। রবীন্দ্রনাথের উদ্দিষ্ট বক্তব্যটিও ঘটনা এবং চরিত্রের স্নেহচ্ছায়াতলে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিয়া নাটকীয় আবেদনকে অপরিহার্য্যতার গৌরব দান করিতে পারে নাই। উপজীব্য ভাব-বস্তুর সহিত নাটকীয় ঘটনা-প্রবাহের যে সম্পর্ক এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা মৈত্রীর নহে, প্রভু-ভৃত্যের। একই দৃশ্যে সূচনার ইঙ্গিতবিহীন এমন নাটকীয় ঘটনাবাহুল্যও অন্য কোন নাট্যকবিতায় দেখা যায় না। কোন গ্রীক নাটক বা সেক্সপীরীয় নাটকের পঞ্চমাঙ্কের অনুরূপ এই ঘটনা-গুরুত্বও ইহার অন্যতম ত্রুটি। নাট্যকবিতার সূক্ষ্ম, হাল্কা জমিনের উপর স্থূল ঘটনার এতখানি মোটা কাজ সত্যই বড় বেমানান হইয়াছে।

এইসকল দোষ-দর্শনের পরও সত্যের খাতিরে বলিতে হইবে যে, ইহাও কবি-প্রতিভার স্বাক্ষর বর্জ্জিত নহে। ভাষা, বর্ণনা ও ছন্দের পারিপাট্য উহার অন্তর্দৈন্য সম্পূর্ণরূপে ঢাকিতে সমর্থ না হইলেও, বাহিরে অজস্র সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়াছে। সার্থক সংলাপ-সৃষ্টিই নাট্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক নহে জানিয়াও আমরা বলিব যে, সংলাপ রচনায় কবি ইহাতে অপূর্ব্ব দক্ষতা

প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, জীবনের গভীরতম কারুণ্য পরিস্ফুটনে এই নাট্যকবিতার শেষাংশটি অনন্য মর্য্যাদার অধিকারী হইয়াছে। প্রেমসাধিকা অমাবাই নিত্যধর্ম্মের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। হৃদয়ের সেই নিত্যধর্ম্মই তাহার একমাত্র বল ও ভরসা, দুঃখ-তিমিরের পরপারের আলোক-শিখা। ইহারই শক্তিতে শক্তিময়ী হইয়া সে অপরাধী পিতাকে ক্ষমার জন্য বিধাতার কাছে একদা প্রার্থনাও জানাইয়াছিল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে চিতাগ্নিতে দেহ ভস্মীভূত করিয়া সেই ধর্ম্মের গৌরব ঘোষণার প্রয়োজন দেখা দিল তখন অমাবাইয়ের প্রেম-সত্যানুভূতির কণ্ঠরোধ করিয়া জীব-জীবনের মর্ম্মান্তিক কাতরতা সমস্ত শ্মশানভূমির আকাশে বাতাসে এই রবে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—"পিতা, পিতা, পিতা মোর!" অমাবাইয়ের এই অসহায় আর্ত্তনাদের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ 'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবনের' করুণ-কাতরতাকে উচ্চাঙ্গের শিল্পসম্মত রূপ দান করিয়াছেন

॥ **নরকবাস** ॥

বাহ্য-রূপের বিচিত্র সৌন্দর্য্যময় প্রকাশের সঙ্গে ভাব-মাধুর্য্য মিলিত হইয়া 'নরকবাস' এবং 'বিদায়-অভিশাপ'কে অনুপম কাব্য-সুষমায় মণ্ডিত করিয়াছে। 'বিদায়-অভিশাপ' যেমন প্রেম-সৌন্দর্য্যের অপরূপ বাঙ্ময় অভিব্যক্তি. 'নরকবাস' তেমনি অপত্য-স্নেহের চিরদীপ্ত বাণী রূপায়ণ। ঘটনাবাহুল্য যেমন 'সতী'র দুর্ব্বলতার হেতু হইয়াছে তেমনি আবার ঘটনার আত্যন্তিক অভাব এই নাট্য-কবিতা দুইটিকে নাটক অপেক্ষা কাব্যেরই নিকট-আত্মীয় করিয়া তুলিয়াছে। প্রস্তাবনার ভঙ্গীতে অতীত ঘটনার মধুর বর্ণনাই ইহাদের মধ্যে মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে। তাই সংলাপের আকর্ষণ সত্ত্বেও ইহাদের নাট্য-মূল্য সামান্য, কবিত্বের গৌরবই সমধিক। পরবর্ত্তী আলোচনায় তাহা আরও বিশদ হইয়া উঠিবে।

প্রথমে 'নরকবাসের' কথা বলিতেছি। চরিত্রগত বা ঘটনাগত কোন সংঘাত-সংঘর্ষেরই পরিচয় সাক্ষাৎভাবে এই নাট্যকবিতাটিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে কিছুটা ঘটনা আছে বটে, কিন্তু সে-ঘটনা দ্বন্দ্বমূলক নহে। তেমনি বিচিত্র ভাবের কথা আছে, কিন্তু অন্তর্বিপ্লব নাই। কাজেই কথোপকথনের ভঙ্গীতে প্রকাশিত গভীর ভাবভূয়িষ্ঠ এবং ভাষা ও ছন্দের অজস্র

সৌন্দর্য্য সমাকীর্ণ একটি অনুপম কবিতারূপেই ইহা অধিক আস্বাদ্য বলিয়া আমাদের ধারণা। পুত্রস্নেহ ও মর্ত্ত্যপ্রীতির পথেই ইহাতে অজস্র দুর্লভ সৌন্দর্য্য সঞ্চারিত হইয়াছে। নাটকীয়ত্ব নিতান্ত একটা বাহ্যভঙ্গী মাত্র, কাব্যসুষমাই ইহার প্রাণ। ভাবগরিমা, শব্দের মধুরতা, উপমা-অলঙ্কার প্রয়োগের লক্ষ্যভেদী সার্থকতা এবং সর্ব্বোপরি আন্তরিক অনুভূতির স্বাধীন প্রকাশ 'বিদায় অভিশাপের' মতই ইহাকে যথেষ্ট কাব্যিক উৎকর্ষ দান করিয়াছে।

সোমকের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিস্ফুটনের সম্ভাবনা ছিল। তাঁহার মধ্যে ক্ষাত্রমর্য্যাদা ও পিতৃধর্ম্মের বিরোধ দেখান চলিতে পারিত, কিন্তু কবি সে সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। লিরিকপ্রবণতা কবিকে এই পথে বিচরণ করিতে না দিয়া সোমকের হৃদয়পুরীর অসীম সৌন্দর্য্য দর্শন করাইয়া ফিরিয়াছে। ফলে আমরা অনুতাপাগ্নিতে দগ্ধ সোমকের চিত্ত সংশোধনের পরিচয় পাইলাম বটে, কিন্তু বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্বে তাঁহার বিমূঢ় বিচলিত অবস্থার চিত্র দেখিতে পাইলাম না। সোমকের নিম্নলিখিত উক্তিটির মধ্যে,—

> সমস্ত-সংসার-সিন্ধু-মথিত অমৃত
> ছিল সে আমার শিশু। মোর বৃন্ত ভরি
> একটি সে শ্বেতপদ্ম, সম্পূর্ণ আবরি
> ছিল সে জীবন মোর ; আমার হৃদয়
> ছিল তারি মুখ-'পরে, সূর্য যথা রয়
> ধরণীর পানে চেয়ে।

তাঁহার স্নেহকোমল পিতৃহৃদয়ের যে অপরূপ পরিচয় পাই তাহা পাঠ করিয়া স্বভাবতই মনে হয়, কবি যেন আপন পিতৃহৃদয়-তন্ত্রীতেই সোমকের সন্তান-স্নেহের এমন কাব্যিক-মূর্চ্ছনা সৃষ্টি করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মর্ত্ত্য-মমতার অনুভূতিটিও এই রচনার কাব্যিক সৌন্দর্য্য বিকাশের অন্যতম কারণ হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবী হইতে সদ্য আগত সোমককে দেখিয়া প্রেতগণের উল্লাস প্রকাশের মধ্যে এবং তাহাদের মানবের ভাষায় পৃথিবীর 'সুখদুঃখ কাহিনীর করুণ কম্পন' শ্রবণ করিবার বাসনার মধ্যে যেন কবির মর্ত্ত্যমাধুরী পিপাসারই ধ্বনি জাগিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে নরক বর্ণনা সম্ভবত মাইকেল মধুসূদনের কাব্যেই প্রথম। মিলটন ও দান্তের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, বিষয়বৈচিত্র্য সংঘটন ও বিভিন্ন রস সমাবেশ কামনায় মধুসূদন 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র অষ্টম সর্গে নরকের এক বিস্তৃত ও ভয়াবহ বর্ণনা দান করেন। ইহা মৃত্যুর পরে মানুষের প্রায়শ্চিত্ত ও ক্লেশভোগের এক মর্ম্মন্তুদ চিত্র উদ্ঘাটন করে। আলোচ্য নাট্যকবিতাটির ঘটনাস্থল নরক; এমনকি, সোমকের স্বর্গের পথে নরকে প্রবেশের সহিত রামচন্দ্রের নরকদর্শনেরও কতকটা সাদৃশ্য আছে, তথাপি রবীন্দ্রনাথ নরকের চিত্র অঙ্কনে মাইকেলের বীভৎস রসকে সযত্নে পরিহার করিয়াছেন। তাঁহার নরকও তাঁহার লিরিক-কবিকল্পনারই সৃষ্টি,—নিখিলের অশ্রু দিয়া গড়া শোকময় এক অন্ধকার পুরী।—

নিখিলের অশ্রু যেন করেছে সৃজন
বাষ্প হয়ে মহা-অন্ধকারলোক—
সূর্য-চন্দ্র-তারাহীন ঘনীভূতশোক
নিঃশব্দে রয়েছে চাপি দুঃস্বপ্ন-মতন
নভস্তল।

রবীন্দ্রনাথের প্রেতগণকেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। কিন্তু উহার প্রকৃতি ও পথ ভিন্ন ধরণের। নরকের এক পার্শ্বে ত্রিদশালয়, অপরপার্শ্বের নিম্নভাগে মর্ত্ত্যভূমি। এই উভয় লোকের উজ্জ্বল সুন্দর পবিত্র মধুময় জীবন হইতে বঞ্চিত হইয়া অহরহ তাহাদের অন্তরে অনুতাপের যে দংশন চলিতে থাকে তাহাতেই তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেতগণের মর্ত্ত্য-কৌতূহলের সহিত মধুসূদনের কল্পনার সাদৃশ্য দুনিরীক্ষ্য নয়। 'মেঘনাদ বধ কাব্যে' দেখা যায় যমপুরীর বিলাপ-বনে রামচন্দ্র প্রবেশ করিলে,—

লক্ষ লক্ষ প্রাণী সহসা বেড়িল,—
সবিস্ময়ে রঘুনাথে, মধুভাণ্ডে যথা
মক্ষিকা। শুধিল কেহ সকরুণ স্বরে,
কে তুমি শরীরি? কহ, কি গুণে আইলা

এ স্থলে ? দেব কি নর, কহ শীঘ্র করি
কহ কথা ; আমা সবে তোষ গুণনিধি,
বাক্য-সুধা বরিষণে ! যেদিন হরিল
পাপপ্রাণ যমদূত, সেদিন অবধি
রসনাজনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমরা।
জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি,
বরাঙ্গ, এ কর্ণদ্বয়ে জুড়াও বচনে ! (৩৫ :—৬১।৮)

ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের নরকপুরী বর্ণনার সহিতও মাইকেলের বিলাপ-পুরীর কিছুটা সাদৃশ্য চোখে পড়ে। মধুসূদন উহার বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

কতদূরে সীতাকান্ত পশিলা কান্তারে—
নীরব, অসীম, দীর্ঘ ; নাহি ডাকে পাখী,
নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে,
না ফোটে কুসুমাবলী—বনসুশোভিণী। (৩৪৫—৪৮।৮)

এই দৃশ্যই রবীন্দ্রনাথের লিরিক-কল্পনায় সূর্য্য-চন্দ্র-তারাহীন ঘনীভূত শোকের মহা-অন্ধকারলোকে পরিণত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ইহজীবনের পথেই মহাজীবনের যাত্রায় বিশ্বাসী ছিলেন। ইহলৌকিক জীবন পরম্পরায় সূত্রে স্মৃতির মালা গাঁথিতে গাঁথিতে আমরা মহাজীবনাধীশের সমীপবর্ত্তী হইতে থাকি। এই ধারণা এই নাট্যকবিতায়ও কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহজীবনের কর্ম্মফলজনিত অনুতাপ সোমক অমর্ত্ত্যলোকেও ভোগ করিতেছেন,—স্মৃতির মঞ্জুষায় করিয়া তিনি ইহজীবনের চয়ন পরলোকে লইয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রানুশাসন ও বুদ্ধিমত্তার উপরে হৃদয় ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা দেওয়াই 'নরক-বাসের' লক্ষ্য এবং সেই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ঋত্বিক অপেক্ষা সোমকের প্রতিই পাঠকের অধিক আকর্ষণ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সেই চেষ্টায় তাঁহাকে কতকটা অস্বাভাবিকতার অনুসরণ করিতে হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তীকালের 'বিসর্জ্জন' ও 'মালিনী'র রাজতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের যে বিরোধ এখানেও তাহার ছায়াপাত দেখা যায় এবং সেই পুরাতন পন্থা অনুসরণ করিয়াই এখানেও তিনি পুরোহিতের শাস্ত্রবিধি পালনের নির্ম্মমতার উপরে হৃদয়বত্তার

মহনীয়তাকে জয়ী করিয়াছেন। রঘুপতি, ক্ষেমঙ্কর, ঋত্বিক একই কল্পনার সামান্য পরিবর্ত্তিত রূপ। প্রসঙ্গত 'দুরাশা' গল্পের কেশরলালের উল্লেখও এখানে করা যাইতে পারে। সংস্কারগত আচারধর্ম্মশীল ভণ্ডব্রাহ্মণরূপেই কেশরলালের চরিত্রটি চিত্রিত হইয়াছে। একমাত্র 'রাজা ও রাণী'র দেবদত্ত চরিত্র ছাড়া রবীন্দ্র-সাহিত্যে সদাচারদীপ্ত কোন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের সপ্রশংস উল্লেখ দেখা যায় না। অন্যত্র ব্রাহ্মণের সম্পর্কে কবির লেখনী যেখানেই প্রশংসামুখর হইয়াছে সেখানেই দেখা যায় যে, তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের প্রতি নিষ্ঠা নয়, তাঁহার চরিত্রের মানবসুলভ আদর্শই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'চিত্রা'র 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটির এবং কবির বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-তর্পণের উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে।

ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এমন বিরুদ্ধ মনোভাবের মূল কারণটি অনুসন্ধানযোগ্য। তাঁহার রচনাদি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্মের মস্ত বড় একজন সমর্থক ছিলেন। তাঁহার নিজের উপনয়ন ক্রিয়াদি বৈদিক মন্ত্রানুসারেই সম্পন্ন হইয়াছিল।[১] অতএব ব্রাহ্মণের প্রকৃত মহিমা ও প্রাধান্যে এবং ভারতবর্ষের সনাতন সমাজ ব্যবস্থায় তাঁহার অটুট শ্রদ্ধা থাকিবারই কথা।[২] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মণের মধ্যে

১। দ্রষ্টব্য, পিতৃদেব : জীবনস্মৃতি

২। গোরা কহিল,—আমার আর কিছুই বলবার নেই—ভারতবর্ষকে আপনি আপনার সহজ বুদ্ধি সহজ হৃদয় দিয়ে দেখুন, একে আপনি ভালোবাসুন। ভারতবর্ষের লোককে যদি আপনি অব্রাহ্ম বলে দেখেন তা হলে তাদের বিকৃত করে দেখবেন এবং তাদের অবজ্ঞা করবেন—তাহলে তাদের কেবলই ভুল বুঝতে থাকবেন—যেখান থেকে দেখলে তাদের সম্পূর্ণ দেখা যায় সেখান থেকে তাদের দেখাই হবে না। ঈশ্বর এদের মানুষ করে সৃষ্টি করেছেন; এরা নানারকম করে ভাবে, নানারকম করে চলে, এদের বিশ্বাস এদের সংস্কার নানারকম; কিন্তু সমস্তেরই ভিত্তিতে একটি মনুষ্যত্ব আছে; সমস্তেরই ভিতরে এমন একটি জিনিস আছে যা আমার জিনিস, যা আমার এই ভারতবর্ষের জিনিস, যার প্রতি ঠিক সত্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তার সমস্ত ক্ষুদ্রতা-অসম্পূর্ণতার আবরণ ভেদ করে একটি আশ্চর্য মহৎসত্তা চোখের উপরে পড়ে—অনেক দিনের অনেক সাধনা তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন দেখা যায়, দেখতে পাই অনেক কালের হোমের অগ্নি ভস্মের মধ্যে এখনো জ্বলছে, এবং সেই অগ্নি এক দিন আপনার ক্ষুদ্র দেশকালকে ছাড়িয়ে উঠে পৃথিবীর মাঝখানে তার শিখাকে জাগিয়ে তুলবে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না। এই ভারতবর্ষের মানুষ অনেক দিন থেকে অনেক বড়ো কথা বলেছে, অনেক বড়ো কাজ করেছে, সে-সমস্তই একেবারে মিথ্যা হয়ে গেছে এ কথা কল্পনা করাও সত্যের প্রতি অশ্রদ্ধা—সেই তো নাস্তিকতা।

—গোরা : রবীন্দ্ররচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড (১৩৬৩ আশ্বিন), ৪৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা—

তাঁহার সেই সনাতন ব্রাহ্মণ্য আদর্শ দেখিতে পান নাই। একদিন যে ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও যত্নে প্রাচ্য সভ্যতার সুদৃঢ় ধারণস্তম্ভরূপে দেশের তাবৎ নরনারীর সম্মুখে মুক্তি ও সত্যের পথ নির্দ্দেশ করিত আজ তাঁহারই নিদারুণ অমনোযোগ ও প্রলোভনের ফলে সেই ধর্ম্ম মানবাত্মার মুক্তির সহায়তা না করিয়া বরং বন্ধন রজ্জুতে পরিণত হইয়াছে, দুর্ব্বলের উপর প্রবলের পীড়নের উপায় হইয়া উঠিয়াছে। এ যুগে ব্রাহ্মণ কতখানি আদর্শচ্যুত হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেটি কালীপ্রসন্ন সিংহের এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। তথাকথিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অন্তঃসারশূন্য ধর্ম্মাচারকে ধিক্কৃত করিবার জন্য তিনি কাঞ্চন মূল্যের বিনিময়ে তাহাদের টিকি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। এই উপায়ে তাঁহার 'টিকি মিউজিয়ামে' প্রচুর টিকি সংগৃহীত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'টিকিমেধ যজ্ঞ' নামক কবিতাটি এই ঘটনা উপলক্ষেই রচিত।[১] বর্ত্তমান সমাজ জীবনের অতিশয় বিশৃঙ্খল, বীভৎস ও বিভীষিকাময় রূপই রবীন্দ্রনাথের মনে ব্রাহ্মণ সম্পর্কে অনাস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সিদ্ধান্তের সমর্থন তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলির মধ্যেও মিলিবে।—

> ধর্ম ব্যাহত হইয়াছে বলিয়াই সমস্ত সমাজ কলুষিত অন্তঃসার-শূন্য হইয়াছে—তাই ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণ নহে, ক্ষত্রিয় আর ত্রাণকর্তা নহে, বৈশ্য নিজের ব্যবসায়ে সন্তুষ্ট নহে—সকলেই রিক্ত কাঠামোটির চারিপাশে ভূতের মতো ঘুরিয়া মরিতেছে। আমাদের এই সমাজ-প্রধান দেশে ব্রাহ্মণের আবশ্যক আছে। যথার্থ ব্রাহ্মণ সমাজের একান্ত প্রয়োজন আছে। তাঁহারা দরিদ্র হইবেন, পণ্ডিত হইবেন, ধর্মনিষ্ঠ হইবেন—সর্বপ্রকার আশ্রমধর্মের আদর্শ ও আশ্রয় স্বরূপ হইবেন ও গুরু হইবেন।[২]

এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের এই 'যথার্থ ব্রাহ্মণে'র ধারণা প্রধানত উপনিষদের উচ্চ অধ্যাত্ম-চিন্তার দ্বারাই পরিপুষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার কাছে ন্যায়-নীতি-সত্যনিষ্ঠা ও উদার অধ্যাত্ম-প্রেরণাই ব্রাহ্মণের প্রধান ঐশ্বর্য্য-

১। দ্রষ্টব্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ঃ সাহিত্য ও সাহিত্যিক, ৪৯-৫০ পৃষ্ঠা

২। ব্রাহ্মণঃ স্বদেশ

গৌরব বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ শুধু সত্যপালন ও অধ্যাত্ম ভাবমার্গে বিচরণ করাকেই জীবনের একমাত্র ধ্রুব লক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করেন নাই; বিপদের দিনে রাজাকে মন্ত্রণা দান করিয়াছেন, এমন কি, প্রয়োজন হইলে শাস্ত্রালোচনা ও লেখনী ফেলিয়া দেশরক্ষাকল্পে অসিও ধারণ করিয়াছেন। হৃদয়বল, তপোবল ও শস্ত্রবল ব্রাহ্মণের মধ্যে একাধারে মিলিত হইয়া একদা যে বিরাট বিপুল শক্তির সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই দীর্ঘকাল আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক সঙ্কটের মুহূর্ত্তে ভারতবর্ষের রক্ষা-কবচের কাজ করিয়াছে। শুধু জন্মগত অধিকার নয়, এই অমেয় শক্তিই একদিন ব্রাহ্মণকে সমাজদেহের শীর্ষস্থানে বসাইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট ব্রাহ্মণ চরিত্রগুলিতে প্রায়শ ব্রাহ্মণের তপোবলপূত শক্তিসমন্বিত এই মূর্ত্তিটিরই সাক্ষাৎ মিলে।

॥ বিদায়-অভিশাপ ॥

শুধু নাট্যকবিতা বলিয়া নহে, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতারাজির মধ্যেও 'বিদায়-অভিশাপের' একটি অনন্য স্থান রহিয়াছে। 'চিত্রা' কাব্যের 'স্বর্গ হইতে বিদায়ের' সাদৃশ্যে অনায়াসে ইহারও নামকরণ হইতে পারিত 'মর্ত্ত্য হইতে বিদায়'। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'মরুশিখায়' সত্যসত্যই এই নামের একটি কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়।

এই নাট্যকবিতাটির তপোবন প্রকৃতির বর্ণনায় এবং কচ ও দেবযানীর অতীত স্মৃতি-চারণার পংক্তিতে পংক্তিতে কবি-প্রতিভার উজ্জ্বল রশ্মি-বিচ্ছুরণ দেখা যায়। প্রকৃতি, পশুপক্ষী ও মানব লইয়া প্রাচীন ভারতের যে তপোবন জীবন উহারই এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিপূর্ণ চিত্রালেখ্য অতিদক্ষ শিল্পীর ন্যায় কবি এখানে অঙ্কিত করিয়াছেন। সঙ্গীতে ও ধ্বনিতে সে-চিত্র অনুপম হইয়া উঠিয়াছে। ব্যঞ্জনাধর্ম্মী বর্ণনার গুণে তপোবনের বটবৃক্ষ, হোমধেনু এবং বেণুমতী নদীটি যেমন চিত্রপটে অত্যন্ত উজ্জ্বল ও মনোরম হইয়া উঠিয়াছে তেমনি তপোবনবাসী নরনারীদের দৈনন্দিন আশ্রম জীবনও সূক্ষ্ম বর্ণাভাসে ও অকম্পিত রেখার টানে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তপোবনমুগ্ধতা আশৈশব কবির জীবনে যে স্থায়ী রস-উৎসরূপে বিরাজ করিত এই চিত্র-বর্ণনা তাহারই এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

এই যুগের প্রেমকবিতাগুলির আধারে যৌবনধন্য জীবনের বৃন্তে পুষ্পিত যে পরম উপলব্ধিটির কথা রবীন্দ্রনাথ বহুবার প্রকাশ করিতে গিয়াও দ্বিধাসঙ্কোচ ও রুচিশালীনতার বাধাবশত পারিয়া উঠেন নাই, সেই পরম উপলব্ধিটি—

হায়,
বিদ্যাই দুর্লভ শুধু, প্রেম কি হেথায়
এতই সুলভ।

* * *

রমণীর মন
সহস্র বর্ষেরই সখা, সাধনার ধন।

—এখানে একটি শাস্ত্রবাক্যের গুরুত্ব লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সংলাপের এই 'playful and serious grace' ইহার অন্যতম সৌন্দর্য্য-উৎস। এই প্রেম-সৌন্দর্য্য বর্ণনার গুরুত্ব বিচারে ইহার বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে রচিত 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যের সহিত ইহার সগোত্রতা উপেক্ষণীয় নহে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৩০১ সালে 'চিত্রাঙ্গদা'র যে সংস্করণটি প্রকাশিত হয় উহার সহিত 'বিদায়-অভিশাপ'ও সংযোজিত হইয়াছিল। এখানকার সেই প্রেমকল্পনার প্রসঙ্গে 'শ্রীমতী স্রোতস্বিনী'র মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য। সে বলিয়াছে,—

> কচদেবযানী সংবাদেও মানবহৃদয়ের এক অতি চিরন্তন বিষাদকাহিনী বিবৃত আছে, সেটাকে যাঁহারা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন এবং বিশেষ তত্ত্বকেই প্রাধান্য দেন তাঁহারা কাব্যরসের অধিকারী নহেন।[১]

কেবল কাব্য-কল্পনার চমৎকারিত্বই নহে, নাট্য-প্রতিভার কিছু কিছু বিস্ময়কর প্রকাশও ইহাকে মহৎ সৃষ্টির মর্য্যাদা দান করিয়াছে। দেবযানী আপন চিত্তব্যাকুলতার মাপকাঠিতেই কচকে বুঝিতে চাহিয়াছিল। প্রেমের মোহে অন্ধ হইয়া, কচের পক্ষে যাহা খণ্ড সত্য মাত্র, উহাকেই পূর্ণ সত্যের গৌরব দান করিয়া দেবযানী এক মধুর সুখ-স্বপ্নলোক মনে মনে নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাই কচের বিদায় গ্রহণের স্থির সঙ্কল্পের কথা জানিবার পরও তাহাকে বলিতে শুনি,—

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: কাব্যের তাৎপর্য: পঞ্চভূত

জানি সখে,
তোমার হৃদয় মোর হৃদয়-আলোকে
চকিতে দেখেছি কতবার, শুধু যেন
চক্ষের পলকপাতে ; তাই আজি হেন
স্পর্দ্ধা রমণীর। থাকো তবে, থাকো তবে,
যেয়ো নাকো। সুখ নাই যশের গৌরবে।
হেথা বেণুমতীতীরে মোরা দুইজন
অভিনব স্বর্গলোক করিব সৃজন
এ নির্জন বনচ্ছায়া-সাথে মিশাইয়া
নিভৃত বিশ্রব্ধ মুগ্ধ দুইখানি হিয়া
নিখিলবিস্মৃত। ওগো বন্ধু, আমি জানি
রহস্য তোমার।

প্রেমময়ী দেবযানীর প্রাণ এমনই অবোধ যে, নির্ম্মম সত্যকে সম্মুখে প্রকট দেখিয়াও সে কিছুতেই উহাকে আমল দিতে পারিতেছে না। তাহার প্রীতিরস-সঞ্জীবিত হৃদয়ে মিলন-কামনা এক তীব্র আবেগরূপে দেখা দিয়াছিল, সুখসুন্দর ভবিষ্যৎ জীবনের কল্পনায় তাহার প্রাণ-মন ছিল ভরপুর। তাহার সেই আশা-উজ্জ্বল প্রাণের সুর মুক্তকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে নিম্নের পংক্তি কয়টির মধ্যে—

ধরা পড়িয়াছ বন্ধু, বন্দী তুমি তাই
মোর কাছে। এ বন্ধন নারিবে কাটিতে।
ইন্দ্র আর তব ইন্দ্র নহে।

দেবযানীর অন্তরস্থিত এই আশা-মহীরূহের বর্ণনা দিয়া কবি অপূর্ব্ব কৌশলে এখানে এক 'নাটকীয় সন্ধি-সংস্থান রচনা করিয়াছেন। কেননা, ইহার পরই দেখা দিয়াছে সেই আশা বটবৃক্ষের মূলোৎপাটনজনিত মর্ম্মান্তিকতা—

আমার হৃদয়
বিদ্যা নিতে এসে কেন করিলে হরণ
স্বর্গের চাতুরীজালে। বুঝেছি এখন,
আমারে করিয়া বশ পিতার হৃদয়ে

চেয়েছিলে পশিবারে—কৃতকার্য হয়ে
আজ যাবে মোরে কিছু দিয়ে কৃতজ্ঞতা,
লব্ধমনোরথ অর্থী রাজদ্বারে যথা
দ্বারীহস্তে দিয়ে যায় মুদ্রা দুই-চারি
মনের সন্তোষে।

এবং এই তীব্র মর্ম্মজ্বালাজনিত অভিশাপ বর্ষণের অভিনব নাটকীয়ত্ব,—

তোমা 'পরে
এই মোর অভিশাপ—যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ; তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ;
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

ইহার সহিত সাদৃশ্যসূত্রে মহাভারত হইতে অনুরূপ আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া ত্রয়োদশ বর্ষের জন্য দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব যখন বনবাসে কাল যাপন করিতেছিলেন তখন ইন্দ্র তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনকে একবার স্বর্গে উপনীত করেন। অর্জ্জুন সেখানে কয়েক বৎসর বাস করিয়া গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের নিকট নৃত্যগীতাদি শিক্ষায় ব্রতী হন। এই স্বর্গবাসকালে স্বর্গ-অপ্সরী উর্ব্বশীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। কিন্তু উর্ব্বশী প্রেম নিবেদন করিলে অর্জ্জুন তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে অভিমানিনী স্বর্গ-নর্ত্তকী উর্ব্বশী অর্জ্জুন এক বৎসর কালের জন্য নপুংসক হইয়া থাকিবেন,—এই অভিশাপ প্রদান করে। বিরাট-রাজগৃহে অজ্ঞাত বাসকালে অর্জ্জুনের পক্ষে এই অভিশাপ বর হইয়া উঠিয়াছিল।

দেবযানীর চরিত্র পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের প্রেম-ধ্যান অতিশয় জীবন্ত ও স্বভাবাশ্রয়ী অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। প্রেমই যে নারীসত্তার একমাত্র অবলম্বন এমন ধারণা রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র প্রকাশ করিয়া থাকিলেও, এখানেই যে তিনি সেই ব্যাপারে সর্ব্বাধিক মুক্তকণ্ঠ হইয়াছেন তাহাতে আমরা নিঃসন্দেহ। শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব এই নাট্যকবিতায়ও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, এমন কি ঐ দ্বন্দ্বের সূত্রেই ইহার নাটকীয়তা। উপরন্তু, সেই দ্বন্দ্বে শ্রেয়পন্থার মুখ চাহিয়া কবি প্রেমের সাকার বিগ্রহের উপাসিকা দেবযানীকে

আদর্শের যূপকাষ্ঠে বলি দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তথাপি মর্ত্ত্য-জীবনে প্রেয়-কামনার অনিবার্য্যতা ও অভিপ্রেয়তাকেও তিনি অভিনন্দন না জানাইয়া পারেন নাই। দেবযানীর কণ্ঠে যেন কবিরই অবচেতন-মনের প্রেয়-তৃষ্ণা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।—

হায়, সখা, এ তো স্বর্গপুরী নয়।
পুষ্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়
মর্ম-মাঝে, বাঞ্ছা ঘুরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে
লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারম্বার ফিরে
মুদ্রিত পদ্মের কাছে।

প্রেয়-কামনাই দেবযানীর প্রতি কবিকে অত্যন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। সচেতন বুদ্ধিতে যাহার পূর্ণ সমর্থন নিজের মধ্যে পান নাই, হৃদয় পরিসেবিত সমবেদনার অর্ঘ্য দিয়া তাহাকেই তিনি বিনা কুণ্ঠায় এবং সগৌরবে বরণ করিয়াছেন। ফলে দেবযানীর চরিত্র-চিত্রণ এমন সার্থক ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, কচের কাছে তাহার আপাত পরাজয় সত্ত্বেও পাঠকের হৃদয়াসনে সে রাজরাজেশ্বরীর মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। প্রসঙ্গত এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, দেবযানী কতকাংশে পূর্ব্ববর্ত্তী 'রাজা ও রাণী'র ইলা এবং 'চিত্রাঙ্গদা'র নাম-চরিত্রের সগোত্র। সে ইলার ন্যায় প্রেমমুগ্ধা, চিত্রাঙ্গদার ন্যায় আত্ম-সচেতন। রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' গল্পে নবাবকুমারীর আশাভঙ্গের যে তীব্র খেদোক্তি, যে গভীর হতাশ্বাস,—

হায় ব্রাহ্মণ, তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর এক জীবন-যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।

ইহারই পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায় দেবযানীর বিক্ষোভে—

হে ব্রাহ্মণ! তুমি চলে যাবে স্বর্গলোকে
সগৌরবে, আপনার কর্ত্তব্যপুলকে
সর্ব দুঃখশোক করি দূরপরাহত,
আমার কী আছে কাজ, কী আমার ব্রত।

আমার এ প্রতিহত নিষ্ফল জীবনে
কী রহিল, কিসের গৌরব।

মহাভারতের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বিশিষ্টা ও তীক্ষ্ণ বাস্তববোধসম্পন্না, স্বতঃস্ফূর্ত্ত অপর্য্যাপ্ত প্রাণশক্তি ও জীবনরসপিপাসাময়ী দেবযানীর মধ্যে গভীর একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ মিশাইয়া রবীন্দ্রনাথ এই অসামান্যা নারীকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের কচ আদর্শ পুরুষ। হৃদয়ে প্রেমের পুলক-শিহরণ অনুভব করা সত্ত্বেও মহৎ আদর্শানুপ্রাণিত এই চরিত্রটি কর্ত্তব্যসাধনাকেই জীবনের চরম লক্ষ্য করিয়াছিল। দেবযানীকল্পিত অভিনব স্বর্গলোকে প্রেমের বিচিত্র রস আস্বাদন না করিয়া দেবলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেবগণকে নূতন দেবত্ব দানই তাহার কাছে শ্রেয় বলিয়া মনে:হইয়াছে। প্রেমের স্বাভাবিক দাবিকে দুর্জ্জয় সঙ্কল্পের শক্তি দিয়া বশ করিয়া সে বলিয়াছে,—

দেব সন্নিধানে শুভে, করেছিনু পণ
মহাসঞ্জীবনীবিদ্যা করি উপার্জন
দেবলোকে ফিরে যাব; এসেছিনু তাই,
সেই পণ মনে মোর জেগেছে সদাই,
পূর্ণ সেই প্রতিজ্ঞা আমার, চরিতার্থ
এতকাল পরে এ জীবন; কোনো স্বার্থ
করি না কামনা আজি।

॥ কর্ণ-কুন্তী সংবাদ ॥

দুইটি চিত্তের বেদনাসিন্ধু মন্থনজাত রসনির্য্যাস দিয়া কবি 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদে'র বাণী-মূর্ত্তিটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রথম যৌবনের পর্য্যাপ্ত জীবন অভিজ্ঞতাহীন অপরিপক্ক বুদ্ধিতে একদিন কুন্তী যে ভুল করিয়াছিলেন তাহাই নিষ্ঠুর নিয়তির ভয়াল ভীষণ রূপ ধরিয়া মাতাপুত্রকে গভীর হইতে গভীরতর বিপর্য্যয়ের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। লজ্জাশরম, দ্বিধাদ্বন্দ্বমিশ্র কুন্তীর মাতৃ-হৃদয়ের পরিচয়টি বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে এবং বহুলাংশে গান্ধারী অপেক্ষা অধিক সৃষ্টি সার্থকতা অর্জ্জন করিয়াছে। বাৎসল্য-রসে কবি-প্রাণ এইকালে কিরূপ বিমুগ্ধ ছিল তাহার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে 'সোনার তরী'র 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি। সমুদ্র ও বসুন্ধরার মধ্যে

মাতা-কন্যার সম্পর্ক কল্পনা করিয়া কবি বাৎসল্য রসের এক মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু কবি ইহাও জানেন যে হৃদয়ের সেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত অগাধ স্নেহ-প্রীতি সংসারের নিদারুণ বিধিবিধান ও নির্ম্মম নিয়তির রূঢ় কটাক্ষ দ্বারা নিয়ত লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। ইহাই জীবনকে বড় করুণ ও বিষাদাচ্ছন্ন করিয়া তোলে। মহাভারতের অজস্র নরনারীর মধ্যে কর্ণ ও কুন্তী এমনই দুই বিষলাঞ্ছিত চরিত্র। মায়ের আদিম পাপ মাতাপুত্র উভয়ের জীবনকেই তলে তলে শূন্যগর্ভ করিয়া দিয়াছিল। পুরোহিতের পুত্রমেধ যজ্ঞে বাধা না দিয়া সোমকও নিত্যধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন। কিন্তু তাঁহার আত্মসংশোধনের পথ নির্দ্দেশ করিয়া কবি তাঁহার এক প্রশান্ত পরিণামচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। দুঃখ ও অনুতাপের পথেই তিনি সত্যের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। কুন্তীর ক্ষেত্রেও তীব্র অন্তর্দ্দাহের পরিচয় পাই। কিন্তু তাঁহার বেলায় রবীন্দ্রনাথ কুরুক্ষেত্র মহাসমর শেষের মর্ম্মন্তুদ হাহাকার ব্যতীত অন্য কোন মহান্ পরিণতির আভাস দিতে পারেন নাই। হয় তো ইহাকেই কবির স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইয়াছে। সন্তান সম্বন্ধে পিতা অপেক্ষা মাতার দায়িত্বই অধিক বলিয়া তিনি মনে করিয়াছেন। কুন্তী সমাজের ভয়ে কানীন পুত্রকে ত্যাগ করিয়া নারীধর্ম্ম তথা মাতার ধর্ম্মে যে আঘাত হানেন তাহাই বিশ্ববিধানকে বিচলিত করে। তাই পরবর্ত্তীকালে তাঁহার সমস্ত সযত্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিশ্বনিয়মের করাল গ্রাস হইতে জন্মমুহূর্ত্তের সেই পরিত্যক্ত সন্তানকে তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না। কর্ণও জানিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন অভিশপ্ত, জন্মক্ষণেই মাতৃপরিচয় ও মাতৃস্নেহ হইতে যিনি বঞ্চিত হন তাঁহার মত দীন হতভাগ্য ত্রিভুবনে কেহ নাই। পরে জননীর প্রসারিত স্নেহালিঙ্গনও তাঁহার দুর্ভাগ্যের বোঝা হ্রাস করিতে অক্ষম। তাই প্রশান্ত কণ্ঠে ও স্থির গাম্ভীর্য্যে তিনি মাতাকে বলিয়াছেন,—'জন্মমুহূর্ত্তে আপনি আমাকে কুলশীলমানহীন মাতৃস্নেহবঞ্চিত অন্ধ অজ্ঞাত এই বিরাট বিশ্বে ত্যাগ করিয়াছিলেন, আমি অনুরোধ করিতেছি তেমনি সুনিশ্চিত মৃত্যু ও পরাজয়ের মধ্যে আজও আমাকে ত্যাগ করিয়া যান।'

তাঁহাদের জীবনে, বিশেষত কর্ণের জীবনব্যাপী সফলতা বিফলতার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে অদ্ভুত এক ট্র্যাজিক সুর। ট্র্যাজিক চরিত্রের সমস্ত উপাদানই কর্ণের মধ্যে বর্ত্তমান। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভা মহাকাব্যিক নয়, গীতিকাব্যিক। তিনি বহুবার মুক্তকণ্ঠে মহাকাব্য রচনার অসামর্থ্যের কথা

ঘোষণা করিয়াছেন। এই সূত্রে ১৯৩৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারীর একটি পত্রাংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। কবি জানাইয়াছেন,—

> আমার কবিতায় আমি সাহিত্যের নানাবিধ রূপের অবতারণা করিয়াছি, কেবল কখন মহাকাব্য লিখিবার প্রয়াস মনে জাগে নাই। নিশ্চয় জানিবেন তাহার কারণ মহাকাব্য রচনা আমার আয়ত্তের অতীত, সেই কারণেই সহজেই তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। মহাকাব্য সম্বন্ধে আমার অশ্রদ্ধা নাই, অক্ষমতা আছে। [১]

সেই কারণেই কর্ণের মহাকাব্যের নায়কোচিত চরিত্র-গরিমা নয়, তাঁহার জীবনের অপরিসীম কারুণ্যকেই নাটকীয় ব্যঞ্জনামিশ্রিত গীতিসুরের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ এই নাট্যকবিতায় প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

এই নাট্যকবিতাটিতে চরিত্রের সংখ্যাই শুধু স্বল্প নহে, বাহ্য ঘটনার উল্লেখও নাম মাত্র। অথচ সেই স্বল্প উপাদান লইয়াই তিনি অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। ইহার যে দ্বন্দ্ব, তাহার সমস্তটাই সংস্কার, আদর্শ বা কর্ত্তব্যঘটিত দ্বন্দ্ব, অতএব অন্তর্দ্বন্দ্ব। সেই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে কর্ণ ও কুন্তী, উভয়ের চিত্তই সমভাবে আলোড়িত ও বিমথিত। কবি সুকৌশলে তাঁহাদের চিত্ত-সরসীর সেই আবর্ত্তন-রেখাকে পাঠকের অনুভবযোগ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া তুলিয়াছেন। তাহা ছাড়া, কাহিনীর মধ্যে আগাগোড়া ট্র্যাজিক সুর বজায় রাখিয়া বাহ্য নাট্য-লক্ষণের অভাব পূরণ করিতেও তিনি সমর্থ হইয়াছেন। কর্ণ ও কুন্তীর জীবনের সুগভীর হতাশার ভাবটি পাঠকের হৃদয়ে অব্যর্থ রেখায় অঙ্কিত করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব্ব কৌশলে আসন্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরিবেশটি তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখিয়াছেন। অধিকন্তু, নাটকীয় সংস্থান সৃষ্টির সুযোগও তিনি কোথাও উপেক্ষা করেন নাই। কর্ণের সংলাপে বিপরীত ভাবের অদ্ভুত দ্বন্দ্ব মুহুর্মুহুই ধরা পড়িয়াছে।—

দেবী, কহো আরবার
আমি পুত্র তব।

১ দ্রষ্টব্য, সোনার বাংলা, ২৬শে বৈশাখ ১৩৬০ সাল

মাতৃস্নেহাতুর কর্ণের আকুল মিনতি যখন এই বাক্যটিতে উত্তাল আবেগে শত ধারায় ঝরিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে কুন্তীর মাতৃহৃদয় বিমথিত করিয়া পূর্ণ সত্যের স্বাক্ষরে ধ্বনিত হইল—

পুত্র মোর!

সর্ব্বসংশয়োত্তীর্ণ মাতৃপরিচয়ের সেই অতিশয় মধুর ক্ষণেই নূতন করিয়া সংশয়, জিজ্ঞাসা ও দ্বন্দ্বের আবির্ভাবে কর্ণের চিত্ত ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। ভাগ্যের ছলনায় বারংবার পরাজিত তাঁহার কণ্ঠে তীব্র অভিযোগের আকারে উচ্চারিত হইল—

কেন তবে
আমারে ফেলিয়া দিলে দূরে অগৌরবে
কুলশীলমানহীন, মাতৃনেত্রহীন
অন্ধ এ অজ্ঞাত বিশ্বে।

ইহার পরও মাতৃমন্ত্রমুগ্ধ কর্ণ বলিয়াছেন,—

মাতঃ, দেহো পদধূলি, দেহো পদধূলি,
লহ অশ্রু মোর!

কিন্তু সেখানেও কবি অসীম কৌশলে পরবর্ত্তী পরিণতির জন্য একটি নাটকীয় সংঘাত-সম্ভাবনাকে অঙ্কুরিত করিয়াছেন। পর মুহূর্ত্তেই কর্ণকে বলিতে শোনা যায়—

মাতঃ, সূতপুত্র আমি, রাধা মোর মাতা।

একদিকে মাতৃ-জঠরের স্বাভাবিক আকর্ষণ, অন্যদিকে আপন চারিত্র-পূজার উপচার-স্বরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার,—এই দুই বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির সংঘাতে কর্ণ সত্যই আপন কক্ষচ্যুত। আর কৈশোরের এক মুহূর্ত্তের একটি ভুলের জন্য কুন্তীর জীবন হইতেও শান্তি-সুখ-আশা-আনন্দ চিরদিনের মত বিদায় লইয়াছে। অনুতাপের তীব্র জ্বালা ও নিদারুণ দুঃখভোগই তাঁহার বর্ত্তমান জীবন। সেই হিসাবে 'কর্ণ-কুন্তীসংবাদ' প্রকৃতই অশ্রুসিক্ত পথে জীবন পরিক্রমার অপরূপ এক বাণী-বিগ্রহ!

রোম্যাণ্টিক কবি-কল্পনার শত সৌন্দর্য্য বিচ্ছুরণ ইহার অপর দুর্লভ বৈশিষ্ট্য। ইহার দ্বারা জানা অজানার এক অপরূপ মোহাবেশ সৃষ্টি করিয়া কবি মানব অদৃষ্টজালের দুর্জ্ঞেয়তার ইঙ্গিত দিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত যে কয়টি নাট্যকবিতার কথা আলোচিত হইল তন্মধ্যে 'গান্ধারীর আবেদন'-এর নাট্যসংঘাত অপেক্ষাকৃত অধিক। এখানেও অবশ্য দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে আদর্শগত বিরোধ ভাবনা হইতেই এবং সেই কারণেই ইহাও অন্তর্দ্বন্দ্ব-মূলক। তবু আভ্যন্তরীণ সে-দ্বন্দ্ব-চিত্রকে বাহিরে প্রতিফলিত করিবার জন্য ইহাতে বাহ্য ঘটনারও কিছু কিছু সমাবেশ করা হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের কথোপকথন, ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গান্ধারীর আগমন এবং পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন, গান্ধারীর সহিত ভানুমতীর সাক্ষাৎকার ও কথোপকথন এবং দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবের গান্ধারীসমীপে গমন ও বনযাত্রার পূর্ব্বে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা,—এইগুলিই এই নাট্যকবিতার বাহ্যঘটনা। স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনীর বুকে যেমন দুই পারের দৃশ্যাবলীর প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে তেমনি এই নাট্য-কবিতার স্বচ্ছন্দ প্রবহমান ঘটনাস্রোতের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহকোমল অথচ পরিতাপবিদ্ধ অন্তঃকরণের চিত্র, দুর্য্যোধনের পৌরুষদীপ্ত মূর্ত্তি এবং গান্ধারীর সুমহান আদর্শদীক্ষিত সমুন্নত চরিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। এই নাট্যকবিতা মূলত ব্যক্তিবোধের উপর বিশ্ববোধের, অহংএর উপর আত্মার এবং মানব হৃদয়ের অন্ধমোহের উপরে ন্যায়ধর্ম্ম ও অখণ্ড সত্যধর্ম্মের জয় ঘোষণার জন্যই পরিকল্পিত হইয়াছিল। দুর্য্যোধন 'ক্ষুদ্র আমি' অর্থাৎ অহংএর দাসত্ব করিয়াছেন; ধৃতরাষ্ট্র প্রবৃত্তির প্রেরণায় আমরা যাহা ইচ্ছা করি সেই প্রেয়কেই একান্ত নির্ভরতায় আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন। এই দুইয়ে বেশ সাদৃশ্য আছে এবং উভয়েই পরিপূর্ণ-মানবধর্ম্মের বিরোধী। গান্ধারীর মধ্যে অনন্তবোধের যে প্রেরণা ছিল তাহার সহিত উহার পরম শত্রুতা। কোন্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া কবি এই নাট্যকবিতার চরিত্র পরিকল্পনা করিয়াছেন নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে পাঠক তাহার কতকটা আভাস পাইবেন।—

> মানুষ আছে তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা তার জীবভাব, আর-একটা বিশ্বভাব। জীব আছে আপন উপস্থিতকে আঁকড়ে, জীব চলছে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্র প্রদক্ষিণ করে। মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্তা সে আছে আদর্শকে

> নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মতো নয়, বস্ত্রের মতো নয়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন্ দিকে নির্দেশ? যে দিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যে দিকে তার পূর্ণতা, যে দিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, যে দিকে বিশ্বমানব। [১]

'গান্ধারীর আবেদনের' প্রধান দ্বন্দ্ব এই জীবভাব ও বিশ্বভাবের মধ্যে। এই দ্বন্দ্বে কবির সচেতন বুদ্ধি বিশ্বভাবেরই জয় ঘোষণা করিতে চাহিলেও তাঁহার সে-চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয় নাই। ইহার প্রমাণ, গান্ধারী আমাদের নিরুত্তাপ মনের শ্রদ্ধাটুকু মাত্র আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন; অপর পক্ষে, ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধন আমাদের সমগ্র চিত্তের সহানুভূতি ও মমতার আসন দখল করিয়া লইয়াছেন। গান্ধারীর দৃঢ়তার উপরে দুর্য্যোধন চরিত্রের দৃঢ়তাই গোপনে জয়ী হইয়াছে। ভারতীয় উচ্চ জীবন-নীতির বিচারে দুর্য্যোধনের শক্তিদম্ভ বিসদৃশ বলিয়া ঠেকিলেও তাঁহার যুক্তির জোরালতাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কবির মুক্তবুদ্ধির নির্ম্মল সত্য তাঁহার মানবিক সংস্কারের ঊর্দ্ধে উঠিয়া সর্ব্বত্র যে নির্দ্বন্দ্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই, ইহা তাহারই এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের গান্ধারী অলৌকিক গুণসম্পন্না, পুণ্য-বলবতী, স্বর্গবাসিনী দেবীগণেরই সগোত্র হইয়াছেন। কিন্তু, 'শোকহীন হৃদিহীন সুখস্বর্গভূমি' তো কোনদিনই কবির কাম্য হইয়া উঠে নাই; শোকে-তাপে-দুঃখে-পাপে-ভরা অসম্পূর্ণ এই মর্ত্ত্যভূমিই তাঁহার কাম্য ছিল। এই কারণেই গান্ধারীর জন্য ন্যায়বুদ্ধির পূর্ণ সমর্থন রাখিয়াও, জীবভাবের ভাবুক ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনকেই তিনি, হয়তো নিজেরও অজ্ঞাতে, অধিক আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছেন।

স্বর্গের পূর্ণতা অপেক্ষা অপূর্ণ মর্ত্ত্যভূমির প্রতি কবির এই পক্ষপাতিত্বের স্বরূপটি সুস্পষ্ট করিবার জন্য একটি উদ্ধৃতির সাহায্য লওয়া যাইতে পারে।—

> মনে হয়, পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম। স্বর্গ আর কি দিত

১। মানুষের ধর্ম: রবীন্দ্র রচনাবলী, ২০শ খণ্ড, ৩৭৩-৪ পৃঃ

জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা-দুর্বলতাময় এমন সকরুণ আশঙ্কা-ভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত। [১]

চিত্রার 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতাটির নিম্নোল্লিখিত পংক্তিগুলিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।—

থাকো, স্বর্গ, হাস্যমুখে—করো সুধাপান,
দেবগণ। স্বর্গ তোমাদেরি সুখস্থান,
মোরা পরবাসী। মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে,
সে যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দুদিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দুদণ্ডের তরে।
যত ক্ষুদ্র, যত ক্ষীণ, যত অভাজন,
যত পাপীতাপী, মেলি ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমল বক্ষে বাঁধিবারে চায়—
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্যে থাক্ সুখে-দুঃখে অনন্তমিশ্রিত
প্রেমধারা অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।

কবিপ্রকৃতির এই স্বভাবানুর্ত্তনের ফলেই ধর্ম্মের 'দীপ্ত বজ্রশূল'-এর আঘাতকে এবং 'শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি'কে অস্বীকার না করিয়াও রবীন্দ্রনাথ ধৃতরাষ্ট্রের মানব-সংস্কারজাত পিতৃত্বের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ন্যায়-নীতি-ধর্ম্ম-তত্ত্বকথা সমস্ত কিছুর উপরেও ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহদুর্ব্বল পিতৃ-হৃদয়েরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহার মুখে নিশ্চিত প্রত্যয়ের সুরে ধ্বনিত হইয়াছে,—

১। ছিন্নপত্র, ১৮-সংখ্যক পত্র

ধর্মবিধি বিধাতার—
জাগ্রত আছেন তিনি, ধর্মদণ্ড তাঁর
রয়েছে উদ্যত নিত্য ; অয়ি মনস্বিনী,
তাঁর রাজ্যে তাঁর কার্য করিবেন তিনি।
আমি পিতা—

'আমি পিতা'—এই বাক্যটি যেন একটি ধ্রুবপদের মতই বারবার উচ্চারিত হইয়া পাঠকের মনে ধৃতরাষ্ট্রের পিতৃ-হৃদয়ের পরিচয়কে স্থায়ীভাবে রেখাঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। গান্ধারীর মাতৃত্ব এমন প্রতিষ্ঠা পায় নাই। ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়ের ভাষায় বলা যাইতে পারে, 'ধৃতরাষ্ট্রের এই সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বলীলা গান্ধারীর দৃপ্ত দীপ্তি অপেক্ষাও নাটকীয়।' [১] সর্ব্বশেষে আমাদের বক্তব্যের সমর্থনপক্ষে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে।—

> এই কাব্যনাট্যে (?) গান্ধারীর চরিত্র প্রধান হইলেও, ধৃতরাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত অপ্রধান হইলেও সে-ই ইহার নায়ক হইয়া উঠিয়াছে। কবির হয়ত ইচ্ছা ছিল গান্ধারী পাঠকের সমবেদনাকে সবচেয়ে বেশি করিয়া আকর্ষণ করুক, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই; ধৃতরাষ্ট্রই পাঠকের সমবেদনার সকলের চেয়ে বড় অংশীদার। এমন হইবার কারণ ধৃতরাষ্ট্র-চরিত্রে ট্র্যাজেডির দ্বন্দ্বজাত বেদনা আছে, গান্ধারী-চরিত্রে তাহা নাই। রাজমাতার হৃদয়ে পুত্রদের পাপাচার-জনিত মাতৃগর্ব্বনাশী গ্লানি আছে, পুত্রত্যাগের দুঃখ আছে, কিন্তু ধর্ম্মত্যাগের, মহত্তর দুঃখ নাই। 'অন্তরে বাহিরে অন্ধ' ধৃতরাষ্ট্রের চরিত্রে পুত্রের জন্য ধর্ম্মত্যাগের দুঃখ আছে; ধর্ম্মত্যাগের জন্য গ্লানি আছে, এই দুঃখের বেদনাই তাহার শুভ্রশীর্ষে ট্র্যাজেডির আগ্নেয় কিরীট পরাইয়া দিয়াছে। [২]

এই মন্তব্যটি পাঠ করিবার পর 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম সর্গে বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণ ও চিত্রাঙ্গদার শোকাকুল মূর্ত্তি দুইটির দিকে একবার

১। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, ২য় খণ্ড
২। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ১ম খণ্ড (১ম সং), ২১ পৃষ্ঠা

তাকাইলেও গান্ধারী চরিত্রের অস্বাভাবিকতা উপলব্ধি করা যাইবে। রাবণের পুত্রস্নেহের অনুরূপ প্রকাশ ধৃতরাষ্ট্র চরিত্রেও দেখি। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা চরিত্রে গান্ধারীর বিপরীত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। উভয়েই রাজসমীপে অভিযোগ লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, অথচ উভয়ের অভিযোগের প্রকাশ কত স্বতন্ত্র। গান্ধারীর প্রার্থনা,—

মহারাজ, শুন মহারাজ,
এ মিনতি। দূর করো জননীর লাজ;
বীরধর্ম করহ উদ্ধার; পদাহত
সতীত্বের ঘুচাও ক্রন্দন; অবনত
ন্যায়ধর্মে করহ সম্মান—ত্যাগ করো
দুর্যোধনে।

চিত্রাঙ্গদার অভিযোগটি নিম্নরূপ :—

"একটি রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি,
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি
পাখী। কহ, কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ? কোথা মম অমূল্য রতন?
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধর্ম্ম; তুমি
রাজকুলেশ্বর; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?" (৩৪৫—৫৫।১)

ইহা হইতে উভয়ের চরিত্রগত পার্থক্য স্পষ্টভাবেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে।

কুন্তীর সহিত তুলনা করিলেও গান্ধারী চরিত্রের অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ে। সন্তানের প্রতি জননীর একান্ত স্নেহবন্ধনের দায়ে কুন্তী আপন পাপজীবনের কাহিনীও পুত্রের কাছে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অন্যদিকে ধর্ম্মের উচ্চ মঞ্চে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য গান্ধারী পুত্রকে পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

কাহারও কাহারও বিশ্বাস 'গান্ধারীর আবেদন' রূপক শ্রেণীর রচনা।[1] উহার কাহিনী, ঘটনা ও চরিত্রের অন্তরালে রবীন্দ্রনাথ পরাধীন ভারতবাসীর রাজনৈতিক জীবনের নিদারুণ অসহায়তার একটি ভয়াবহ বাস্তবনিষ্ঠ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন এবং সমসাময়িক সামাজিক ইতিহাসের বহু কলঙ্কময় ঘটনারও কিছু কিছু ইঙ্গিত দিয়াছেন বলিয়া ইঁহাদের ধারণা।[2] এই জাতীয় বিশ্লেষণের বিবরণ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র জীবনী', প্রথম খণ্ডের ৩৪৪ পৃষ্ঠা এবং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবি-রশ্মি', পূর্ব্ব-ভাগের ৪৫৫-৫৭ পৃষ্ঠার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রভাতকুমার রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসবিচারে চারুচন্দ্রের দক্ষতাও কম নহে। তথাপি ঐ ব্যাখ্যার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা সমীচীন বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। জীবন-নাট্যের দর্শক সমাজ-সচেতন কবি মাত্রেরই সৃষ্টিতে সমসাময়িক ঘটনাবলী অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এখানেও তাহাই হইয়াছে, হয়তো কিছুটা অধিক পরিমাণেই হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া প্রত্যেকটি চরিত্র, ঘটনা ও উক্তির মধ্যে যদি উদ্দেশ্যান্তর আরোপ করা যায় তাহা হইলে বস্তুভার বাড়ে বটে কিন্তু রসের পাত্র শূন্য হইয়া যায়। 'বিদায়-অভিশাপ' (কচ-দেবযানীসংবাদ)-এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবসানান্তে পঞ্চভূতের সভায় কবি যে মন্তব্যটি করিয়াছিলেন রসবিচারের ক্ষেত্রে উহার গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি বলিয়াছেন,—

> এই পর্যন্ত বলিতে পারি যখন কবিতাটা লিখিতে বসিয়াছিলাম তখন কোন অর্থই মাথায় ছিল না, তোমাদের কল্যাণে এখন দেখিতেছি লেখাটা বড় নিরর্থক হয় নাই—অর্থ অভিধানে কুলাইয়া উঠিতেছে না। কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির রচনাশক্তি পাঠকের রচনাশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। এ যেন আতশবাজিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া—কাব্য সেই অগ্নিশিখা, পাঠকের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতশবাজি। আগুন ধরিবামাত্র কেহ বা হাউইয়ের মত একেবারে আকাশে উড়িয়া যায়,

১। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, ২য় খণ্ড

২। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ, ১ম খণ্ড, ২১ পৃষ্ঠা (১ম সং)

> কেহ বা তুবড়ির মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কেহ বা বোমার মত আওয়াজ করিতে থাকে। তথাপি মোটের উপর শ্রীমতী স্রোতস্বিনীর সহিত আমার মতবিরোধ দেখিতেছি না। অনেকে বলেন, আঁটিই ফলের প্রধান অংশ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহার প্রমাণ করাও যায়। কিন্তু তথাপি অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি ফলের শস্যটি খাইয়া তাহার আঁটি ফেলিয়া দেন। তেমনি কোন কাব্যের মধ্যে যদিবা কোন বিশেষ শিক্ষা থাকে তথাপি কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি তাহার সম্পূর্ণ কাব্যাংশটুকু লইয়া শিক্ষাংশটুকু ফেলিয়া দিলে কেহ তাহাকে দোষ দিতে পারে না।[১]

ইহার পর 'গান্ধারীর আবেদনের' রূপক-রূপ ব্যাখায় আমরা ভরসা পাইলাম না। রবীন্দ্রনাথের সব যুগের কবিতায়ই দুই চারিটি করিয়া রূপক-কবিতা যে না আছে তাহা নয়, বরং এই যুগেই তাহার সংখ্যা কিছু অধিক। কিন্তু 'গান্ধারীর আবেদন' রূপক শ্রেণীর কবিতা নহে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। সে-বিশ্বাসের মূল ইহার আবেদনের সার্ব্বজনীনতায়। কবির মনে কোন নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের বাসনা থাকিলে এমন সার্ব্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করা কিছুতেই সম্ভব হইত না।

'গান্ধারীর আবেদন' ভাবের উদাত্ততা এবং ছন্দ ও ভাষার গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। ইহার স্তরে স্তরে সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্যের প্রশান্ত রমণীয় বিচিত্রতা। রবীন্দ্রনাথ কথায় কথায় উপমা অলঙ্কারের তুলিতে পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে বিরাট ও মহান ভাবব্যঞ্জনাময় ছবি আঁকিয়া দিয়াছেন। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

> নক্ষত্র অসংখ্য থাকে সৌভ্রাত্রবন্ধনে—
> এক সূর্য, এক শশী। মলিন কিরণে
> দূর বন অন্তরালে পাণ্ডুচন্দ্রলেখা
> আজি অস্ত গেল—আজি কুরুসূর্য একা,
> আজি আমি জয়ী।

১। পঞ্চভূত : কাব্যের তাৎপর্য

কুরুরাজগণ,
পৌরুষ কোথায় গেছে ছাড়িয়া ভারত!
তোমরা হে মহারথী, জড়মূর্তিবৎ
বসিয়া রহিলে সেথা চাহি মুখে মুখে,
কেহ বা হাসিলে, কেহ করিলে কৌতুকে
কানাকানি—কোষ-মাঝে নিশ্চল কৃপাণ,
বজ্রনিঃশেষিত লুপ্ত বিদ্যুৎ-সমান
নিদ্রাগত।

সেই রত্ন নিয়ে তবু এত অহংকার!
একি ভয়ংকরী কান্তি, প্রলয়ের সাজ!
যুগান্তের উল্কা-সম দহিছে না আজ
এ মণিমঞ্জীর তোরে? রত্নললাটিকা
এ যে তোর সৌভাগ্যের বজ্রানলশিখা।

* * *

আনিছে শঙ্কিত কর্ণে তোর অলংকার
উন্মাদিনী শংকরীর তাণ্ডবঝংকার।

নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্বাসন
নিম্নমুখে অন্তরের গূঢ় অন্ধকারে
গভীর জটিল মূল স্থদূরে প্রসারে,
নিত্য বিষতিক্ত করি রাখে চিত্ততল।
রসনায় নৃত্য করি চপল চঞ্চল
নিন্দা শ্রান্ত হয়ে পড়ে; দিয়ো না তাহারে
নিঃশব্দে আপন শক্তি বৃদ্ধি করিবারে
গোপন হৃদয় দুর্গে। প্রীতিমন্ত্রবলে
শান্ত করো, বন্দী করো নিন্দাসর্পদলে
বংশীরবে হাস্যমুখে।

বৎসে, অমঙ্গল
একেলা তোমার নহে। লয়ে দলবল

সে যবে মিটায় ক্ষুধা, উঠে হাহাকার,
কত বীররক্তস্রোতে কত বিধবার
অশ্রুধারা পড়ে আসি—রত্ন-অলংকার
বধূহস্ত হতে খসি পড়ে শত শত
চূতলতাকুঞ্জবনে মঞ্জরীর মতো
ঝঞ্ঝাবাতে। বৎসে ভাঙিয়ো না বদ্ধ সেতু।
ক্রীড়াচ্ছলে তুলিয়ো না বিপ্লবের কেতু
গৃহ-মাঝে।

এই উপায়ে এই নাট্যকবিতাটির সুরে আগাগোড়া যেমন গাম্ভীর্য্য ও উদাত্ততা বজায় রাখা সম্ভব হইয়াছে তেমনি আসন্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অতিশয় ভয়াবহ পরিণামকেও সম্পূর্ণরূপে আভাসিত করিয়া তোলা সহজ হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে অন্যান্য নাট্যকবিতা হইতেও কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতে পারে। উহাদের মধ্যেও নাট্যকবিতায় রবীন্দ্রনাথের অলঙ্কার-সৌষ্ঠব সাধনে অতুলনীয় ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।—

পৃথিবীর অশ্রুকণা

এখনো জড়ায়ে আছে তোমার শরীর,
সদ্যচ্ছিন্ন পুষ্পে যথা বনের শিশির।

অতি উচ্চ বেদনার আগ্নেয় চূড়ায়
জ্বলন্ত মেঘের সাথে দীপ্তসূর্যপ্রায়
দেখা যাবে তোমাদের যুগল মূরতি—
নিত্যকাল-উদ্ভাসিত অনির্বাণ জ্যোতি।

তুমি শুধু চলে যাবে সহাস্য অধরে
নিশান্তের সুখস্বপ্নসম।

বেণুমতী, * * * *
আসিছে শুশ্রূষা বহি গ্রাম্যবধূসম
সদা ক্ষিপ্রগতি,

সন্ধ্যাবেলা যবে
নদীতীরে অন্ধকার নামিত নীরবে
প্রেমনত নয়নের স্নিগ্ধচ্ছায়াময়
দীর্ঘ পল্লবের মতো।

জীবনের সুখগুলি ফুলের মতন
ছিন্ন ক'রে নিয়ে মালা করেছ গ্রন্থন
একখানি সূত্র দিয়ে; যাবার বেলায়
সে মালা নিলে না গলে, পরম হেলায়
সেই সূক্ষ্ম সূত্রখানি দুইভাগ করে
ছিঁড়ে দিয়ে গেলে।

দেবী, তব নতনেত্রকিরণসম্পাতে
চিত্ত বিগলিত মোর, সূর্যকরঘাতে
শৈলতুষারের মতো।

তুমি ধীরে প্রবেশিলে তরুণ কুমার
রঙ্গস্থলে, নক্ষত্রখচিত পূর্বাশার
প্রান্তদেশে নবোদিত অরুণের মতো।

প্রথম দুইটি 'নরকবাস', শেষের দুইটি কর্ণ-কুন্তীসংবাদ' এবং বাকিগুলি 'বিদায় অভিশাপ' হইতে লওয়া হইয়াছে। ইহাদের সার্থকতা বিচারে এ কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রতিটি অলঙ্কারই ঘটনা; পরিবেশ বা চরিত্র সম্পর্কে পাঠকের মনের চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষাটি অতিশয় নিপুণতার সঙ্গে পরিতৃপ্ত করিয়াছে এবং কাব্য-ভাষাকে কবিত্ব কল্পনার মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

এইকালে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল প্রবহমান পয়ার ছন্দের শক্তি পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। নাটক রচনার পক্ষে ছন্দের এই রূপটিই যে, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী নিজের সাহিত্য-সংস্কার দিয়া কবি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার প্রধান প্রধান নাটক শ্রেণীর রচনা এই ছন্দেই বিরচিত। 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' ছাড়া অন্য নাট্যকবিতাগুলির ছন্দও ইহাই। কিন্তু 'গান্ধারীর আবেদন'-এ ছন্দের আধারে যে পরিমাণে নাটকীয় ধর্ম্ম পরিস্ফুট হইয়াছে

অন্য কোনটির মধ্যেই ততখানি হয় নাই, এমন কি পর্য্যাপ্ত ছন্দোগৌরবসম্পন্ন 'কর্ণকুন্তী-সংবাদে'ও নহে। 'গান্ধারীর আবেদন'-এর ছন্দোরূপের বিশেষত্ব হইল বাগ্‌ভঙ্গীর সহিত উহার একাত্মতা সাধন। কণ্ঠস্বর ভঙ্গীর সহিত রবীন্দ্রনাথ এখানে ছন্দের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই দুর্য্যোধন, ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারীর দীর্ঘভাষণগুলিও একঘেয়ে ও কর্ণপীড়াদায়ক হইয়া উঠে নাই। পক্ষান্তরে, সেই সংলাপসমূহ জীবন্তবৎ প্রতীত হইয়া কাহিনীগত অতীত ঘটনাসমূহও যেন এইমাত্র চোখের সামনে ঘটিয়া গেল, মনে এরূপ দৃঢ়প্রত্যয় জাগায়। কৌরব-পাণ্ডবের দ্বন্দ্বের ভীষণতা আমাদের মন-প্রাণকে এমনিভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে সমর্থ হয় যে, উহা যে বিবৃতিমূলক মাত্র তাহা আমরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হই। মনে হয়, দুর্য্যোধনের ঈর্ষ্যাদ্বেষ-চক্রান্তমূলক ঘটনারাজি এবং ধৃতরাষ্ট্রের চিত্তঅবক্ষয়কারী ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার ও গান্ধারীর দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন অটল সঙ্কল্পের প্রকাশ বুঝি আমাদের দৃষ্টির সম্মুখেই ঘটিয়া চলিয়াছে। 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' ছাড়া 'গান্ধারীর আবেদনের' মত এমন পূর্ণ নাটকীয় লক্ষণযুক্ত সংলাপ অন্য কোন নাট্যকবিতায় চোখে পড়ে না। ছন্দের গুণেই কবি-আত্মার একান্ত lyric cry-এর সুরে অনুস্যূত হইয়া গান্ধারীর মহাকাল আহ্বান-মন্ত্রটি বেশ উদাত্ত-গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। নাট্যসুলভ ট্র্যাজিক জীবন-অনুধ্যান যেমন 'কর্ণ-কুন্তীসংবাদের' বিশেষত্ব, নিখুঁত ভাষা ও ছন্দ প্রয়োগ এবং চরিত্রাঙ্কণ-কৌশল তেমনি 'গান্ধারীর আবেদনের' অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন দিক হইতে ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন ও গান্ধারীর চরিত্রের মধ্যে মহাকাব্যসুলভ সমুন্নতির সমাবেশ দেখান হইয়াছে; ইহারা রবীন্দ্রনাথের চরিত্র-চিত্রণ দক্ষতার সার্থক উদাহরণ। যেন পাথর কুঁদিয়া এই মূর্ত্তি তিনটি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। নাট্যকবিতার চরিত্র-চিত্রশালায় কতক পরিমাণে কর্ণ ও কুন্তী ছাড়া এমন ভাস্কর্য্য-শিল্পসম্মত রূপ আর নাই।

॥ লক্ষ্মীর পরীক্ষা ॥

একই সাহিত্য-রূপের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্বেও 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র প্রকৃতি একটু ভিন্ন ধরণের। ইহা শুধু আয়তনেই দীর্ঘ নহে, নাট্য-লক্ষণেও পরিপূর্ণ। ইহার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেমন অতিশয় প্রখর বাস্তব জ্ঞানের তেমনি প্রশংসনীয় নাট্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ইহার অপর স্বাতন্ত্র্য এই যে, ইহার

কাহিনী স্বকপোলকল্পিত। পুরাতন কাহিনীতে আপন শিক্ষা, রুচি ও মানস-প্রবণতা অনুযায়ী নবীন ভাব-ব্যঞ্জনা দান করিবার চেষ্টা না করিয়া কবি এখানে স্বয়ংসৃষ্ট কাহিনী লইয়াই হাস্যরসের প্রস্রবণ সৃষ্টি ও চরিত্র নির্ম্মাণের চেষ্টায় মাতিয়াছেন। এমন হাস্যরসাত্মক নাট্য-প্রচেষ্টা রবীন্দ্রনাথের কাব্যচ্ছন্দে রচিত অপর কোন নাটকে দেখা যায় না। কতকাংশে ইহা যেন 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭), এবং 'চিরকুমার সভা'রই (১৯২৬) সগোত্র। 'হাস্যকৌতুক' (১৯০৭) ও 'ব্যঙ্গ্যকৌতুকে'র (১৯০৭) কোন কোন রচনার সঙ্গেও ইহার সাদৃশ্য চোখে পড়ে। তবু বলিব যে, 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র ন্যায় এমন পূর্ণাঙ্গ স্বাচ্ছন্দ্য গুণ রবীন্দ্রনাথের অপর কোন প্রহসন বা কৌতুক জাতীয় রচনায়ও সহজলভ্য নহে। বরং এই স্বাচ্ছন্দ্য ও হাল্কা সুরটির দিক দিয়া জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের 'এমন কর্ম্ম আর করব না' (১৮৭৭) এবং 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪) প্রভৃতি প্রহসনের .সহিতই ইহার অধিক নৈকট্য ধরা পড়ে। প্রহসনের এই সুরটি জ্যোতিরিন্দ্র নাথেরও আপন আবিষ্কার নহে। ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের নিকট হইতেই তিনি উহা গ্রহণ করেন এবং সাধ্যমত সংস্কার করিয়া বাংলায় প্রহসনের একটি নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেন।

'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র কাহিনী অংশটুকু এইরূপঃ রাণী কল্যাণীর প্রধান পরিচায়িকা ক্ষীরো। সে অত্যন্ত ঈর্ষ্যাপরায়ণ ও কোন্দলপ্রিয়। আপন স্বভাবগত এই কদর্য্যতা সম্বন্ধে সে সচেতন, কিন্তু সেজন্য মোটেই দুঃখিত নহে। তাহার ধারণা চারিত্রিক সুষমা ঐশ্বর্য্যনির্ভর,—লক্ষ্মীর কৃপা ঘটিলে শুধু ভাণ্ডারেই ধন বৃদ্ধি পায় না, স্বভাবও মহৎ ও মধুর হয়। ক্ষীরোর এই মনোভাবের মধ্যে বর্ত্তমান বিশ্বমানবের এক বিরাট অংশের মনের কথাই যেন প্রকাশ পাইয়াছে। যাহারা মনে করে দারিদ্র্য সর্ব্বগুণনাশী, ক্ষুধার অন্নের সচ্ছলতা ব্যতীত মনুষ্যত্ব অর্থহীন, ক্ষীরো সেই অগণিত দুর্ভাগাদেরই অন্যতম। কিন্তু এই উদরকেন্দ্রিক মতবাদে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ সমর্থন ছিল না। দারিদ্র্যকে তিনি সর্ব্বদা অভাবাত্মক ও চরিত্রের অবনতিসূচক শক্তি বলিয়া মনে করেন নাই। আত্মিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনে তাঁহার কাছে দারিদ্র্য অভিশাপ নয়, বরং আশীর্ব্বাদরূপেই প্রতিভাত হইয়াছে। জীবনেশ্বরের কাছে দুঃখ-দারিদ্র্যের পীড়নকে অবিচলচিত্তে গ্রহণ করিবার শক্তি প্রার্থনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

এই করেছো ভালো নিঠুর, এই করেছো ভালো।
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দাহন জ্বালো॥

আত্মিক দৈন্য ও আর্থিক অভাব, এই দুইয়ের মধ্যে খুব একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়া তিনি স্বীকার করেন নাই। চারিত্রিক মহত্ত্ব কিছুটা দৈবকৃপানির্ভর, বাকিটা সুকঠোর সাধনার দ্বারা লভ্য। এই নাট্যকবিতায় ক্ষীরোর পরিবর্ত্তন ও পরিণতির ইতিহাস বর্ণনা করিয়া কবি সেই সিদ্ধান্তকেই সমর্থন জানাইয়াছেন।

অন্তত একদিনের জন্য হইলেও সমস্ত বিশ্ব-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষীরোর যে অভিযোগ তাহা দূর হইয়াছিল। সত্যসত্যই সে একদিন লক্ষ্মীর কৃপাপ্রসন্ন দৃষ্টি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সেইদিন দেখা গেল যে, ইহার ফলে তাহার চরিত্রের উৎকর্ষ ঘটা তো দূরের কথা, পূর্ব্বের চারিত্রিক দুর্ব্বলতাগুলিই ঐশ্বর্য্যের পরিপোষকতা পাইয়া মাত্রাতিরিক্ত হইয়া উঠিল। তাহার হঠকারিতা ও অহমিকা এমন করিয়াই জাঁকাইয়া উঠিল যে শেষে লক্ষ্মী তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। একটি মাত্র স্বপ্নের স্থায়িত্বকালের জন্য ক্ষীরোর রাজরাণী হইবার যে অভিজ্ঞতা তাহাতে তাহার আর কিছু লাভ হইল না বটে, কিন্তু এই শিক্ষাটি হইল যে, সকলের পক্ষে রাজরাণীর দায় গ্রহণ করা সাজে না; প্রকৃত রাজরাণী যে হইবে তাহাকে সকলের আগে রাজরাণীর গুরুদায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য চরিত্রের অধিকারিণী হইতে হয়। যাহার বড়োর যোগ্যতা নাই তাহার পক্ষে বড় হইতে চাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। তাই স্বপ্নভঙ্গের পর যেন এক মহা দৈবদুর্ব্বিপাকের হাত হইতে রক্ষা পাইল এমনিভাবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে বলিতে শুনি,—

ওমা, তাই তো গো। কী জানি কেমন
সারারাত ধ'রে দেখেছি স্বপন।
বড়ো কুস্বপ্ন দিয়েছিল বিধি—
স্বপনটা ভেঙ্গে বাঁচলেম, দিদি।
একটু দাঁড়াও, পদধূলি লব—
তুমি রাণী, আমি চিরদাসী তব।

এই নাট্যকবিতাটির ঘটনাধারা আদি-মধ্য-অন্ত্যসমন্বিত। ঘটনার এমন সূচনা, বিকাশ ও পরিণতির ধারাবাহিকতা অন্য কোন নাট্যকবিতায় দেখা যায় না। চরিত্র-চিত্রণের সার্থকতায়ও ইহার গৌরব অসাধারণ। ভাস্কর্য্য-শিল্পসম্মত চরিত্র এখানে একটিও নাই। এখানে জীবনের চলার পথে দুই দণ্ডের জন্য দেখা চরিত্রেরই ভিড়। দুই একটি তুলির রেখায়, সামান্য বর্ণাভাসে প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত ও বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। কোন তত্ত্বের মুখপাত্র না হইয়া স্বভাবের তাগিদেই স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে তাহারা আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করিয়াছে। এই চরিত্রসৃষ্টির ব্যাপারে কবির নিপুণতা সম্পর্কে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাহাদের কথোপকথনের সময়ে আমরা শুধু তাহাদের মুখের কথাই শুনি না, তাহাদের মুখচোখের বিশিষ্ট ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত যেন প্রত্যক্ষ করি। রবীন্দ্রনাথ সাধারণত অভিজাত সম্প্রদায়ের কবিরূপে প্রখ্যাত। হয়তো তাঁহার কবিতা এই ধারণা পোষণের কিছুটা উপাদানও জোগাইয়াছে। কিন্তু, তাই বলিয়া তাঁহার সহিত নিম্নস্তরের মানুষের কোন পরিচয়ই ছিল না, এমন ধারণা যথার্থ নহে। তাঁহার কোন কোন নাটকে দেখা যায় যে নিম্নস্তরের পাত্রপাত্রীদের জন্য তিনি কিছুটা স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, আগাগোড়া অভিজাত সম্প্রদায়ের কথা দিয়াই নাট্য-কথা সমাপ্ত করেন নাই। ঐ নিম্নস্তরের নরনারীদের ভূমিকার গুরুত্ব অল্প হইলেও কবির কাছে উহাদের মূল্য কম ছিল না। নাটকের বহু বিরাট ও জটিল আবেদনের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার কালেও কখনও ইহাদের প্রতি তাঁহার যত্নের লাঘব ঘটে নাই। সামান্য দুই একটি রেখার টানে অতি চমৎকারভাবে তিনি তাহাদের চরিত্রের বিকাশ দেখাইয়াছেন। ইহা হইতে সহজেই প্রমাণিত হয় যে, সচরাচর উপেক্ষিত সমাজের সাধারণ লোকদের সহিত তাঁহার যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিল না। যদি তাহাই হইত তবে তিনি তাহাদের মনস্তত্ত্ব ও জীবনদর্শন এত স্বল্প কথায়, এমন স্বাভাবিক ছন্দে প্রকাশ করিতে কখনই সমর্থ হইতেন না। আলোচ্য নাট্যকবিতাটির প্রতিবেশিনীগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই আমাদের মন্তব্যের সারগর্ভতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া যাইবে। ঘটনাধারার পারম্পর্য্য ও স্বাভাবিকতার উপর এতখানি জোর দেওয়া হইয়াছে যে, নাট্যকবিতাটি পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গেই মনে সুদৃঢ় সাহিত্যিক-প্রত্যয়ের (illusion) সৃষ্টি হয়, বোধ হইতে থাকে যেন সমস্ত ঘটনাই চোখের উপর দিয়া ঘটিয়া চলিয়াছে এবং পাত্রপাত্রীরা

সকলেই আমাদের বিশেষ পরিচিত। ফলে এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে, বহুদর্শী রবীন্দ্রনাথ সমশ্রেণীর হাস্যমধুর কোন বাস্তব অভিজ্ঞতারই সাহিত্য-রূপ হয়তো এইখানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তাই ইহার মধ্যে তত্ত্বনিরপেক্ষ জীবন-রস-রসিকতার এমন প্রাণোচ্ছল প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। ক্ষীরোর চরিত্র-পরিকল্পনার মাধ্যমে ইহার মধ্যে হাস্যরসের যে প্রস্রবণ নামিয়াছে উহাই সমগ্র রচনাটির বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে,—হাসিতে সুরু, হাসির মধ্যেই ইহার শেষ। হাসি তামাসার ভিতর দিয়াই দর্শক জীবন সম্পর্কে একটি গভীর সত্য লাভ করে। কথ্যভাষার অতিশয় সাদামাঠা ভঙ্গীতে হসন্ত-প্রধান মাত্রিক ছন্দের হাল্কা চালে রচিত হইবার কারণ ইহাই।

প্রতি পংক্তিতে ছয় মাত্রার দুইটি করিয়া পর্ব্ব। কিন্তু অর্থ-ঘটিত ছেদ-স্থানগুলির সহিত সর্ব্বত্র পর্ব্বভাগের সামঞ্জস্য ঘটে নাই। যতি অপেক্ষা ইহাতে ছেদেরই প্রাধান্য। ছন্দের প্রবহমানতা এই নাট্যকবিতার অন্যতম বিশেষত্ব। অন্ত্যানুপ্রাস সৃষ্টিতেও কবি নানা অভিনব কৌশলের সাহায্য লইয়াছেন এবং এই উপায়ে ইহার মধ্যে হাস্যরসপ্রধান চটুল ভাবের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। বাংলায় একাধিক স্বরসহযোগী একটি ব্যঞ্জনবর্ণের মিলকেই সাধারণত উত্তম মিল বলা হয়। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কাব্য-কবিতার মিলই এই শ্রেণীর। কিন্তু 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'য় মিলের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-নাথ স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। নিম্নে উহার কিছু নমুনা দেওয়া গেল।—

হল কী! তুই যে আছিস রেগেই।
কাজ যে পিছনে রয়েছে লেগেই।
কতই বা সয় রক্তমাংসে,
কত কাজ করে একটা মান্‌ষে!

হোক ব্রাহ্মণ, হোক শুদ্দ্‌র,
সেবা করে মরি পাড়াসুদ্ধ্‌র।

লোক এলে তুই তাড়াবি তাদের,
লোক গেলে শেষে আর্তনাদের

কেন বা ছিল না রস্‌করা?
কেন কর মিছে মস্‌করা

গয়লা তো নন যুধিষ্ঠির।
যত বিষ তব কুদৃষ্টির

নিড়োতেছিলেন চষতেছিলেন
মই দিয়ে ক'ষে ঘষতেছিলেন—

এই নাট্যকবিতার কতকগুলি মিলে অপর যে একটি লক্ষণ চোখে পড়ে তাহা হইতেছে আকস্মিকভাবে বৈপরীত্যের ধারণা সৃষ্টি করা। দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।—

যত রাজ্যের দুঃখী কাঙাল,
যত উড়ে মেড়ো খোট্টা বাঙাল,
'বাপু' বললেই মিলবে স্বর্গ,
'বাছা' বললেই বলবি 'ধর্ গো'।
বিধু খোঁড়া সেটা নেহাত বাঁদর
তারে কেন এত যত্ন আদর!
কেউ বা তাঁহার মাথার ঠাকুর।
টাকাটা শিকেটা কুমড়ো কাঁকুড়
দুঃখও ঢের।—হে মা লক্ষ্মীটি,
তোমার বাহন পেঁচাপক্ষীটি
মাথায় তাহার পরাই সিঁদুর,
জলপান দিই আশিটি ইঁদুর,

এই মিলবিন্যাস ও ছন্দোভঙ্গীর সহিত পরবর্ত্তীকালে রচিত একমাত্র 'ক্ষণিকা' কাব্যের কোন কোন কবিতার বেশ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিষয় ও রসের সহিত ভাষা ও ছন্দ-সামঞ্জস্যের এই অমোঘতাই 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র শক্তি ও সৌন্দর্য্যের উৎস। অতঃপর প্রভাতকুমারের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন—

> 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'র ভাষা ও ভঙ্গি তাঁহার সকল নাটক ও নাট্যকাব্যের ভাষা ও রীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; ইহার ভাষা সরল, বলিবার ভঙ্গি সরস, বিষয়টিও হাস্যোজ্জ্বল আনন্দ কৌতুকপূর্ণ।[১]

১। রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, ৩৪১ পৃষ্ঠা

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আত্মলীন ভাব বা কোন উচ্চতম আদর্শ-ভাবনাকে কল্পিত নরনারীর সাহায্যে বাহিরে মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল নাট্যপ্রচেষ্টার মূলেই দেখা যায়। কিন্তু যেখানে কাহিনী দীর্ঘ এবং বহু পাত্রপাত্রীর ভিড় সেখানে ভাবের একাগ্রতা ও আদর্শনিষ্ঠা খর্ব্ব হইয়াছে—লক্ষ্য ও উপায়ের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম আমলের নাট্যধর্ম্মী সৃষ্টিগুলির মধ্যেও কাব্য ছিল, নাটক ছিল, সর্ব্বোপরি ছিল কল্পনা-কবিত্বের সক্রিয় সহযোগিতা। তবু সকল উপাদান একত্র মিশাইয়া রবীন্দ্রনাথ কোনটিতেই অদ্বৈত সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ, তিনি জীবন্ত মানুষ ও তাহাদের জীবনের বাস্তব সমস্যার চিত্র অঙ্কন অপেক্ষা প্রকৃতির অজস্র রূপ-রস-সৌন্দর্য্যের ভাবময় চিত্র অঙ্কনেরই অধিক অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ নাটকের চরিত্র প্রাণহীন, শুধু এক একটা ভাবের বাহন মাত্র। যখনই কাহিনীর দীর্ঘ বিস্তার, জটিল ঘটনার সমারোহ ও বিচিত্র পাত্রপাত্রীর সমাবেশ-সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে তখনই তিনি বিব্রত বোধ করিয়াছেন। ইহার সমর্থন পক্ষে একজন বিদগ্ধ সমালোচকের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন,—

> রবীন্দ্র-প্রতিভায় নাটক-রচনা তাঁহার কাব্যোচ্ছ্বাসের সমুদ্রের একটা স্থলানুপ্রবিষ্ট শাখানদী। এই সীমাহীন সমুদ্রকে নির্দিষ্ট-সীমা-বেষ্টিত নদীতে রূপান্তরিত করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথকে জহ্নু মুনির মত তরঙ্গবিক্ষোভে খানিকটা নাকানি-চোবানি খাইতে হইয়াছে—তিনি সব সময় ইহাকে সুশৃঙ্খল বিন্যাসের মধ্যে আটকাইতে পারেন নাই। নাট্যকলা যে তাঁহার শিল্প-স্বধর্মরূপে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই, তাহার প্রমাণ তাঁহার একই বিষয়ের উপর লেখা নাটকের মুহুর্মুহুঃ রূপ ও ভাবকেন্দ্রের পরিবর্তনে। যিনি স্বভাব-নাট্যকার তাঁহারও অবশ্য শিক্ষানবীশির যুগ আছে, কোনও বিষয়ের মূলনাট্য-তাৎপর্য হয়ত গোড়া হইতেই তাঁহার নিকট পরিষ্কার হইয়া উঠে না। কিন্তু আত্মস্থতা লাভের পর কবিতার রূপের ন্যায় নাটকের আঙ্গিক ও অন্তঃপ্রকৃতি তাঁহার নিকট

> চূড়ান্তভাবে নির্ণীত হইয়া যায়—মূর্তি আঁকিয়া বা গড়িয়া উহাকে বারবার ভাঙ্গিবার প্রয়োজন হয় না। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে নাট্যকার-সত্তা ছিল, সে সর্বদা পরীক্ষা-বিব্রত, শিল্পীর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে অপ্রতিষ্ঠিত ও অনায়ত্ত রূপসুষমার অনুসন্ধানে অস্থির। এমন কি, যে-রূপক-নাট্য তাঁহার কবিপ্রকৃতির সহিত সর্বাধিক একাত্ম, সেখানেও তিনি নূতন নূতন কল্পনার অঙ্কুশ-তাড়িত, নূতন ভারকেন্দ্রের চারিদিকে আবর্তিত, নূতন ভাঙ্গা-গড়ার নেশায় রূপনির্মিতির পরিপূর্ণ সিদ্ধি হইতে বঞ্চিত। তাঁহার মন্ময়তা এত প্রবল যে, তিনি নাটক লিখিতে গিয়াও আত্মকেন্দ্রিকতার কক্ষাবর্তন হইতে বিরত থাকিতে পারেন নাই—তাঁহার নরনারী এক-একটি মূর্ত ভাববিগ্রহ, কবির বিদেহী চেতনার এক-একটি অর্ধ-পরিস্ফুট মানবিক প্রতীকে পর্যবসিত।[১]

রবীন্দ্রনাথের ছিল মুখ্যত গীতি-প্রতিভা। সেই কারণেই তিনি পরিমিত সীমার মধ্যে, স্বল্প উপাদানের সাহায্যে গূঢ়-গভীর ভাবের অভিব্যক্তি দান করিতে ভালবাসিতেন এবং ইহার চেয়েও প্রিয় ছিল তাঁহার কাছে বিশ্বের সমস্ত বস্তুকে আত্মভাবরসে রসায়িত করিয়া লওয়া। এইরূপ করিয়াই তিনি সর্ব্বাধিক সুখী হইতেন ও পরম তৃপ্তি উপভোগ করিতেন। সেই হিসাবে গীতিকবিতার নিজস্ব বিশিষ্ট ক্ষেত্রটি ছাড়া উপন্যাস অপেক্ষা ছোটগল্পে এবং নাটক ও নাট্যকাব্যাদি অপেক্ষা নাট্যকবিতায়ই তাঁহার অধিক সার্থকতা ঘটিয়াছে। বাহিরের রূপগত পার্থক্যের কথা ছাড়িয়া দিলে গীতিকবিতা, ছোটগল্প এবং নাট্যকবিতাকে একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা চলে—তিনটিতেই একটি ভাব, একটি অবস্থা, একটি রস, একটি সুরের মূর্চ্ছনা সৃষ্টির দিকেই লেখকের পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি থাকে।

নাট্যকবিতাগুলির কাহিনী অনতিবিস্তৃত। পাত্রপাত্রীর সংখ্যাও অপরিমিত নহে; তদুপরি প্রাচীন সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে কাহিনী ও পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচনের সুবর্ণ সুযোগটি পাওয়ায় কবিকে নূতন সৃষ্টির দায় গ্রহণ করিতে হয় নাই। যাহা ছিল উহাকেই খসড়ারূপে লইয়া উহার উপর নিজের ধ্যানধারণার ও রসকল্পনার আলোকসম্পাত করিয়াছেন মাত্র। ফলে পুরাতন নূতন সৃষ্টির

১। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, ২৬৫ পৃষ্ঠা

মহিমা লাভ করিয়াছে, চরিত্রকল্পনা মিথ্যাশ্রয়ী হয় নাই এবং গীতি-প্রতিভা জটিলতা জালে আবদ্ধ হইবার আশঙ্কায় বিপন্নবোধ করে নাই। আলোচ্য নাট্যকবিতাগুলির চরিত্রাবলী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের জীবনের একটি চরম মুহূর্ত্ত কাহিনীর যে অংশে প্রতিফলিত হইয়াছে সেই অংশটুকু মাত্র অবলম্বন করিয়াই উহারই মধ্যে প্রতিটি চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মন-প্রাণ-চিত্তের চরম সঙ্কটকালীন অবস্থা অতিশয় নিপুণতার সঙ্গে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই উপায়ে উপাদানের শিথিলতা ও সামঞ্জস্য-হীনতা দূর করিয়া এক-একটি নাট্যকবিতায় এক-একটি সংহত শিল্প-মূর্ত্তি গড়া সম্ভব হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ এখানেও সম্পূর্ণ আত্মনিরপেক্ষ নহেন, ইহা ঠিক; প্রতিটি প্রধান পাত্রপাত্রীর মধ্য দিয়া কবির নিজস্ব আদর্শ-ভাবনাই মুখ্যত রূপায়িত হইয়াছে। তথাপি আত্মগত ভাব-কল্পনার সহিত পরকীয় চিত্ত-সংঘাতের সামঞ্জস্য সাধন এখানে যতটুকুও ঘটিয়াছে একমাত্র তাহার ছোটগল্প ছাড়া আর কোথায়ও এমনটি চোখে পড়ে না। সাধারণভাবে বলিতে পারা যায় যে, **lyrical effect**-এর ভিতর মাঝে মাঝে **dramatic touch**-এর সংযোগ দ্বারাই তিনি এই ক্ষেত্রটিতে অনুপম সাহিত্যসিদ্ধি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই আলোচনার সমাপ্তি ঘটাইবার পূর্ব্বে সর্ব্বশেষে ইহা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি যে, চরিত্রসৃষ্টির নিপুণতায়, ভাবপ্রকাশেরউপযোগী কাহিনী চয়ন ও পরিবেশ (situation) সৃষ্টিতে, নিখুঁত পারিপাট্যময় ভাব-রূপ নির্ম্মাণক্ষম শব্দপ্রয়োগ কৌশলে, ভাবের উপযোগী ছন্দসঙ্গীত ও ধ্বনিবৈভব নির্ম্মাণ ক্ষমতায়, উপমা অলঙ্কারের মণিদ্যুতি বিকিরণে এবং সর্ব্বোপরি দুই বিপরীত ভাব-সংঘাতের কোন বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে বিভিন্ন মানব-মানবীর কামনা-বাসনা-ইচ্ছা-রুচির করুণ পরিণতির চিত্র অঙ্কন পারদর্শিতায় একাধিক নাট্যকবিতা সম্পূর্ণ রসোত্তীর্ণ ও বিরল মর্য্যাদার অধিকারী হইয়াছে। একাঙ্কিকা নাটিকার ধর্ম্ম ও রীতি-রূপ ইহারা প্রায়শ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অধিকাংশ একাঙ্কিকার সহিত তুলনায় ইহাদের শক্তি ও সৌন্দর্য্যের অপরিসীমতা সহজেই প্রমাণিত হইবে। 'বিদায়-অভিশাপ' 'গান্ধারীর আবেদন', 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' এবং 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' যে সাহিত্যের আনন্দভোজে চিরকালের রসিক সমাজকে আনন্দ দান করিতে থাকিবে, সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।